দিনলিপি

সৈয়দ মুজতবা আলীর মাঝে মাঝে দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল। এইসব দিনলিপির মধ্যে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অনেক মূল্যবান চিন্তা ও তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা, পারিবারিক জীবনের বহু খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা দিনলিপিগুলি। এইসব দিনলিপিগুলি থেকে হয়তো আত্মজীবনী লেখার বাসনাও তাঁর ছিল। এইরকম একটি অসম্পূর্ণ রচনা 'আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা'। মাত্র দুটি পৃষ্ঠার পর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। উক্ত রচনাটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হল। বাংলা ১৩৬৭ সালে লেখক কলকাতা থেকে রাজশাহী যান। সেখানে থাকেন প্রায় দেড়মাস। ঐ সময় একটানা দেড়মাস ধরে দিনলিপি রাখেন। এই দিনলিপির মধ্যে রাজশাহী-পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা লেখকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রিয়তার একটি অমূল্য নিদর্শন। ১৯৪৭ সালে লেখককে দক্ষিণভারতে কিছুকাল থাকতে হয়। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র ও প্রকৃতি তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। এই সময়ের দিনলিপিতে সমুদ্র সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যে বর্ণনা লেখেন সেটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

—সম্পাদক

আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা

আমার অগ্রজ তাঁর বাল্য, কৈশোর ও পরিণত জীবন যে দেশকালপাত্রের ভিতর কাটে তার বর্ণনা লিখছেন। এতে করে প্রধানত শ্রীহট্টবাসী, গৌণত পূর্ব-পাকিস্তান, এমন কি আসামবাসীরাও উপকৃত হবেন। মুখবন্ধে তিনি বিশেষ করে নবীন সেনের দৃষ্টান্ত তুলে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন যতদূর সম্ভব চেপে গিয়ে সেই সময়ের কথা বলবেন বেশী। এ অতি উত্তম প্রস্তাব ও সাতিশয় বিনয়ের লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীহট্ট জেলার কৃতী-সন্তানের কাছে তাঁর দেশবাসী তাঁর জীবন সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে উৎসুক। আর কিছু না হোক, স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা অন্তত জানতে চাইবে, তিনি কি করে শিক্ষাজীবনে ম্যাথামেটিক্স-ফিজিক্স অধ্যয়ন করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, ভৌগোলিক, তথা আর্ট ও স্থাপত্যের পণ্ডিত হলেন। বস্তুত অধুনা প্রকাশিত তাঁর 'চর্যাপদ' সম্বন্ধে অতিশয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ না পড়ার পূর্বে আমারও জানা ছিল না, ভাষাতত্ত্বেও তিনি কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

কিন্তু এস্থলে এটা আমার মূল বক্তব্য নয়। মমাগ্রজ আমাকে অনুরোধ করেছেন, যেহেতু আমরা একই পাঠশালে একই স্কুলে পড়েছি, অতএব আমিও যদি আমার বাল্যস্মৃতি স্মরণ করি তবে তাঁর ভুলে যাওয়া কথাগুলিও তাঁর স্মরণে আসবে।

এটিও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিপদ এই যে আমি প্রায় ষোল বছর বয়েসে, ইস্কুল পাস করার পূর্বেই দেশ ছেড়ে পশ্চিমবাঙলার শান্তিনিকেতনে চলে আসি এবং পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ বাইরে বাইরে কাটে। গোড়ার দিকে বছরের দুই ছুটিতেই দেশে গিয়েছি, পরবর্তী জীবনে সেটাও সম্ভব হয়নি,—বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে।

মানুষ বিদেশে দীর্ঘকাল থাকলে বাল্যস্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। তার কারণ দেশে থাকলে দেশের লোকজন ঘরবাড়ী তাকে পুনঃ পুনঃ প্রাচীন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি ক্রমে ক্রমে দেশের নানা প্রাচীন কীর্তিকাহিনীও সে শোনবার সুযোগ লাভ করে—বাল্যে যেগুলোর প্রতি স্বভাবতই তার কোনো কৌতূহল ছিল না।

আমার ভাগ্যে হয়েছে উল্টোটা। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, সিলেটী বলা দূরে থাক, বাঙলা বলারও সুযোগ ঘটেনি। দেশের লোকজন, ছেলেবেলার

ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সজীব রাখার জন্য জলসিঞ্চন করার নর্মসখা প্রায় পাইইনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতির অঙ্গানে চটুল নৃত্য জাগাতে হলে এক হাতের করতালি অসম্ভব।

অথচ স্মরণ করিয়ে দিলে এখনো অনেক কিছু মনে আসে।

পূর্বেই আমার ভ্রাতার বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : তিনি গোড়ার দিকে রীতিমত পয়লানম্বরী স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন। আমার তখন হঠাৎ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ছবিটি। দু'তিনখানা তক্তাপোষ-জোড়া বিরাট খাটে সুদূরতম প্রান্তে দাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখের ভাব করেছেন, পাদমেকং ন গচ্ছামি ; বিদ্যামন্দির নৈব নৈব চ। বাবা-মা সাধাসাধি করছেন। কড়ে আঙুলে দোয়াত ঝুলিয়ে বড়দা স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন ও সব্‌চেয়ে বেশী কাকুতিমিনতি করছেন আমাদের সম্পর্কে দাদা আলফী মিয়া। আর আমি এই পাঁচজনের বাইরে 'পাঁচের বাদ'। আমি শুধু ঘুরঘুর করছি চতুর্দিকে। আর ভাবছি, 'আমাকে যেতে দিলে আমি এখখুনি যাই'। তখনো স্কুল নামক ব্যাঘ্রটির সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলে দাদার আতঙ্ক কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হত না।

অথচ দাদা, বলতে বেবাক ভুলে গেলেন—না চেপে গেলেন—যে যখন যেতে আরম্ভ করলেন তখন এক লফ্‌তে গুয়াগাছের মগ্‌ডালে উঠে বসলেন অবহেলে। এবং সেই যে বসলেন, তারপর কখনো তাঁকে কেউ নামতে দেখেনি। পরে সপ্রমাণ হল তিনি আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সব চেয়ে সেরা পড়ুয়া।

সামান্য দু'একটি উদাহরণ দি।

তখনকার দিনে আর কটি মুসলমান ছেলে ইস্কুলে যেত? এবং তাদেরও প্রধান আতঙ্ক ছিল অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি। অথচ সপ্তম শ্রেণীতে উঠে তিনি গায়ে পড়ে নিলেন মেকানিকস্—যার জন্য দরকার তুখোড় ম্যাথ্ জ্ঞান। এবং তখনকার দিনের দুই অঙ্কবিশারদ ক্ষীরোদবাবু (ইনি অল্পবয়সে গত হন) ও গোপালবাবুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। পরবর্তী যুগে কলেজে নিলেন I. Sc., সেও এক বিস্ময়। বি. এস-সিতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তার জন্য প্র্যাকটিকালের একটি দুর্ঘটনা দায়ী। স্থির করলেন, এম. এস-সিতে সেটা তিনি অধ্যাপক রামনের (তখনো রামনরশ্মি আবিষ্কৃত হয়নি ও তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী শিষ্য কৃষ্ণন বিশ্ববিখ্যাত হননি) কাছে শিক্ষালাভ করে পুষিয়ে নেবেন।

দিনলিপি

(১২ই বৈশাখ ১৩৬৭—২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭)

CACUTTA—ISHURDI—RAJSHAHI

১২ই বৈশাখ ১৩৬৭

A terrible journey from Calcutta to Rajshahi.

Yesterday it was 107° here in Calcutta. Fancy catching the train at 16·00, hottest part of the day. Kendu, Mukuldi, Ghantu, Saumen & Prof Saurin Dasgupta at the station.

I do not recollect the times. From 19 to 21 or more at Darsana (India) From 21·30 to 23·45 or so, at Darsana (Pak).

1·35 Ishurdi. No room in the waiting room. Hot like hell even at that early hour. Wait wait till 6. Train left at 7·45. No fan in the compartment till 7·35. Hell again. I thought it was the last leap. No, another change at Abdullapur at about 8.15. jump up & down the railway line ditch. Hot platfrom! Wait for the train. Train left at 8-30. 9-30. at Rajshahi.

রাজশাহী

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৭

এ ক'দিন ধরে পূব বাঙলার সর্বত্রই অসাধারণ গরম যাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ১০৫° পর্যন্ত উঠেছে। ঢাকা ১০২°, দিনাজপুর ১০৬°। রাজশাহী তো terrific তবে তার উত্তাপ কাগজে দেয়নি। এখানকার লোকে বলছে ৫।৭ বছরের ভিতর এ রকম গরম পড়েনি। কাগজ বলছে, উত্তর পশ্চিম থেকে

আসা গরমের ফলে। এখানে এসেছি অবধি সেই হাওয়াই দেখছি। দক্ষিণে পদ্মা—সেখান থেকে এযাবৎ কোনো হাওয়া আসেনি। কালবৈশাখী বা অন্য কোনো প্রকারের বৃষ্টি, রাজশাহী অঞ্চলে অন্তত এখনও হয়নি।

অথচ একেবারে খোলা ছাদে শুয়ে ভোরের দিকে গায়ে একখানা চাদর টানতে হয়।

এখানে আজ এই প্রথম দক্ষিণের বাতাস পেলুম। কিন্তু ১০।১১টার ভিতর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তার পর উত্তর-পশ্চিমের বাতাস। তবে কালকের মত দুর্দান্ত নয় ও পদ্মাকে সাদা সাদা ফেনার ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ করেনি।

উত্তর-পশ্চিমের বাতাস কাল থেকে বন্ধ হওয়াতে গরম অল্প কম।

Message incomplete-এর বদলে একটা কাগজে ছিল massacre incomplete.

খবরটা ছিল কোথাকার যেন ম্যাসাকারের। কিন্তু শেষে messaere incomplete সেনসরের ম্যাসাকার না খবরের ম্যাসাকার বোঝা গেল না।

এবারের গরম পূব বাঙলায়ও ভীষণ। ডেলি কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় রোজই ফ্ল্যাশ করছে। পাঁচ বৎসরে এরকম হয়নি। আমার হিসেবে তারও বেশী। সাতমাস ধরে এদেশে বৃষ্টি হয়নি। Simply terrific.

পশ্চিম বাঙলার কোনো খবর পাচ্ছিনে। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়নি, ঠাণ্ডাও পড়েনি। কারণ তাহলে পূব-বাঙলাকে যে তাতিয়ে তুলেছে উত্তর পশ্চিম থেকে আসা গরম হাওয়ায় সেটা এল কি করে?

শীতে বৃষ্টি হয়নি। গরমে দিনের পর দিন শুকনো কেটে যাচ্ছে, আদপেই বৃষ্টি হল না, এরকম অবস্থা পূব-বাঙলায় আমি কখনও শুনিনি।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭

আজকের কাগজ বলছে, দু'একদিনের ভিতর ঝড়ঝঞ্ঝা হতে পারে। এখানে তার একমাত্র লক্ষণ, আকাশে '০১ হয়, কি না-হয়, উটকো শরৎকালের হাল্কা মেঘ! এখন পশ্চিমের বাতাস বন্ধ। সকালে অল্প দক্ষিণা বাতাস পদ্মার উপর দিয়ে এল—সুশীতল না হলেও বেশ ঠাণ্ডা।

কলকাতায় গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এরকম পর পর এত অধিক তাপ দেখা যায়নি। ১৯৫৯ মাত্র এক দিন ১০৮° থেকে ফের গরমি কমে যায়।

৭।৫।৬০-এর খবরের কাগজ রাজশাহী থেকে ৫।৫-এর খবরে বলছে এখানে নাকি পয়লা মে'তে hottest day with 108° গেছে। ব্যস! তার আগে যে একটা খবর বেরল ২৮।৪-এ এখানে ১১০° গেছে?

ধর্ম জানেন আমি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই যে প্রতি সন্ধ্যায় বিদকুটে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে খচখচানি আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেসুরা বেতালা গান রাত বারোটা-তেরোটা অবধি এরও একটা সীমা থাকা দরকার।

ক্ষীণ চাঁদের আলো, মাথার উপর সপ্তর্ষি, দূর পদ্মার মৃদু গুঞ্জরণ, নারকলগাছের অল্প শিহরণধ্বনি—এছাড়া কোনো শব্দ নেই—শান্ত-গম্ভীর পরিবেশ, কেমন যেন রহস্যময়। এর উপর এই অসহ্য খচখচানি!

মানিকগঞ্জ এলাকায় পদ্মায় ভীষণ ঝড় ও নৌকাডুবি।

কয়েকদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের গরম হাওয়া বন্ধ।

আজ দুপুর আর বিকেল গেল গুমোট গরমে। ১০৮°-এর কম নিশ্চয় নয়।

উনিশটার সময় এল দক্ষিণ থেকে ঝড়—লু। অতিশয় সূক্ষ্ম সাদা ধুলোতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 'দুরাশা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে কুয়াশায়-ঢাকা পৃথিবী দেখে বলেছিলেন, ভগবান যেন রবর দিয়ে সৃষ্টি ঘষে তুলে ফেলতে চান। এখানে সাদা ধুলো দিয়ে। এ ধুলো পদ্মাচরের।

পদ্মা নদী পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

কিছুক্ষণের জন্য সপ্তর্ষি পর্যন্ত লোপ পেল।

নটার সময় সামান্য একটু ক্ষান্ত দিয়ে ফের সমস্ত রাত জোর দক্ষিণের বাতাস বইল। ঠিক ঝড় নয়—ঝোড়ো বাতাস। এখনও চলছে।

আকাশের অতি উচ্চে যে আড়াইখানা ছেঁড়া মেঘ তারা পশ্চিমদিকে চলে গেল।

বিদ্যুৎ চমকালো না, মেঘ ডাকলো না।

বাতাস এ সময় যতটা ঠাণ্ডা হয় ততটাই—কোনো দিকে বৃষ্টি হয়ে থাকলে যতখানি শীতল হয় তার কিছুমাত্র না। নিতান্ত পদ্মার বারো মাইল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে বলে যা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা।

একেবারে মেঘটেঘ না জমেই হঠাৎ ঝড়।

সেই ঝড় যখন তার চরম রুদ্রে তখন দেখি একটা দাঁড়কাক প্রাণপণ তার সঙ্গে লড়ছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশী সে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সে যেন আশ্রয় না খুঁজে অন্য কিছু খুঁজছে। তার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীকে?

কোথায় কালকের লূর পর আজ দিনটা ঠাণ্ডায় যাবে, আজ গেল সব চেয়ে গরম দিন।

ভোরে পদ্মাতে প্রথম স্নান। আমাদের বাড়ির সামনে পদ্মা একটা মাছের বঁড়শির মত হুক করেছে। সেই হুকে রাজ্যের মেয়েমানুষ ভোর থেকে নাইতে আসে। তাদের ঘন ঘন অঙ্গ বিতাড়ন এবং যত্রতত্র মর্দন থেকে বোঝা যায় তারা এই নিদাঘ যামিনী নিষ্কর্মা কাটায়নি; তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই হুকে তো আর নাইতে পারিনে। তাই হুক পেরিয়ে খানিকটে এগোতে হয়। তখন দেখি পায়ের তলায় লিকলিকে ভলভলে প্যাচপেঁচে পলিমাটি। বালুর সুখস্পর্শের বদলে এই স্লাইমি কাদার উপর হেঁটে যাওয়া, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কাদার ক্লেদময় স্পর্শে সর্বাঙ্গে কেমন যেন কিরকির করে। শতশত কিলবিলে বাঙ্ মাছের উপর দাঁড়ালে যে অনুভূতি হয় এ তাই।

জল ভারী সুন্দর। দক্ষিণের বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে সর্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে শীতল করে দেয়।

রাত দশটায় ফের লু। কিন্তু কালকের মত জোরালো নয়। এবং ঠাণ্ডাও নয়। এ অঞ্চলে অন্তত কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

লু কালকেরই মত এল হঠাৎ আচম্‌কা। আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। এখন বুঝলুম পদ্মার ঝড় কেন ভয়ঙ্কর। আকাশে বাতাসে কোনো

প্রকারের ইশারা না দিয়ে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে। আস্তে আস্তে যে গতিবেগ বাড়বে তাও নয়। অসাবধান কেন, সাবধানী দাঁড়ীও এর হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে পারে কি ?

সমস্ত রাত এবং এখনও হিল্লোলের পর হিল্লোলে দক্ষিণ বাতাস।

নবমী

ঠিক কালকেরই মত। অসহ, দুঃসহ না কালকের চেয়ে কম না বেশী এসব আর চিন্তা করার শক্তি নেই।

ঠিক কালকেরই মত রাত দশটায় লু। তবে গোড়াতে কমজোর ছিল। এখন ২২'৪৫ বাড়ছে। ধুলোতে লেখা যাচ্ছে না।

তারপর কিন্তু বাতাস কমে গিয়ে মশার উৎপাত শুরু হল। মশারি খাটাতে হল। সকালে দেখি, হিম পড়েছে। এই প্রথম।

আকাশে কণামাত্র মেঘের চিহ্ন নেই।

সিলেটে জোর বৃষ্টি।

আজ কোনো দিক থেকে কোনো প্রকারের বাতাস ছিল না। গরম অন্য দিনের তুলনায় কম বলেই মনে হচ্ছে। ঢাকা বলেছে, আমাদের এলাকা শুকনো শুকনিতেই যাবে। এটা বলার দরকার ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা মাত্র করতে পারিনে, কোন্ দিক হতে, কি কারণে মেঘ জমতে পারে আর বৃষ্টিই বা হতে পারে। এই যে দক্ষিণের বাতাস আসে সেই বা কোত্থেকে ? বঙ্গোপসাগর থেকে ? কলকাতা ছাড়িয়ে ? তা হলে এত জোর পায় কোথায় ? কলকাতার উপর দিয়ে তো এত জোরে বয়ে যায় না। তবে পদ্মাতেই এর জন্ম ? তাই বা কি করে হয়।

একটা জিনিস বিলক্ষণ বুঝেছি। হঠাৎ এমনই আচম্‌কা এই দক্ষিণের বাতাস আসে—কোনো প্রকার মেঘ না জমে—যে, যে কোনো নৌকার পক্ষে এটা কাল।

প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারলেও সে বাতাস সামলে হাল ধরে নৌকো বাঁচানো শক্তিশালী পুরুষের দরকার। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই আচম্‌কা ঝড় সম্বন্ধে একাধিকবার সাবধান করেছেন।

আজ এগার দিন হল এখানে এসেছি। গরমের ঠেলায় চৈতন্য যেন সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি। মনে হয় মাত্র তিন-চার দিন হল।

রাত এগারটায় দক্ষিণের বাতাস উঠলো। ধুলোর ঝড় না তুলে সমস্ত রাত ব্যজন করে গেল।

আজ দিনটা যেমন তেমন কাটল কিন্তু রাতটা গেল খারাপ। বাতাস ছিল না বললেই হয়। মশারির ভিতর বাইরে শুয়ে আরামহীন রাত।

দিনটা জেঁ্যাও তোঁ্যাও কাটে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই আরম্ভ হয় গরমের সত্য উৎপাত। ঘরটা তেতে ওঠে চরমে—ওদিকে বিজলির জোর কমে গিয়ে পাখা আর ঘুরতেই চায় না। বাইরেও গরম। হাওয়া বন্ধ। কখন বইতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। সেও বইবে গরমই। কারণ চতুর্দিকে বৃষ্টি হয়েছে বা হবার আশা আছে বলে কোনো কাগজ আশা দেয়নি।

রাতটা কাটল দুঃসহ গরমে। অন্য দিনের মত রাত বারোটায়ও ঠাণ্ডা হল না।

গেল দু'দিন ঢাকা ভরসা দিয়েছিল, রাজশাহী অঞ্চলেও বৃষ্টি হতে পারে। আজ তাও প্রত্যাহার করলে।

আজ আরো গরম।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণ থেকে বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা নয়।

পূর্বে কিছুক্ষণ খরার বিজলি হানলে। সন্ধ্যায় ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ জমেছিল। কিছুক্ষণের ভিতর তাও কেটে গেল। মেঘগুলো যেন কোথাকার বর্ষা-ভোজের পর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা এঁটো পাতা। দেখলে হিংসে হয়, কোথাও যেন কপালীরা উত্তম বৃষ্টির উৎসব ভোজ করেছেন। আমাদের কপালে ছেঁড়া পাতা। ক্ষেমা-ঘেন্না করে সেগুলো চাটতে রাজী আছি—যদি তাঁরা বৃষ্টি হয়ে নামেন। তাও তাঁরা নামলেন না।

এখন (২৩'০০) জোর দক্ষিণের বাতাস কিন্তু আরামহীন। পদ্মা মাঝে মাঝে সমুদ্রেরই মত অনেকক্ষণ ধরে একটানা গর্জন রব ছাড়ে। বড় গম্ভীর—তবে সমুদ্রের মত উদ্দাম নয়। পাড়ে এসে ঢেউও মাথা কোটে না। সমুদ্র-পারেরই মত নারকোলপাতার একটানা ঝিরঝির শব্দ। অন্য পাতার সঙ্গে মেশা বলে ঠিক সমুদ্রপারের আওয়াজ নয়।

কাল রাত্রে বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে নিদ্রা হল ভাল।

ভোরে দেখি আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে মন্থর গতিতে রওয়ানা দিয়েছে। পদ্মার বুকে কিন্তু দুর্দান্ত দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস। সেই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে চলেছে খান-চারেক বিশাল মহাজনী নৌকো। দক্ষিণের বাতাস কি কৌশলে পাল দিয়ে কাবু করে নৌকা উজানে পশ্চিম দিকে যেতে পারে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

এখন ১৩'৪৫-এ মৃদুমন্দ কিন্তু গরম বাতাস। মেঘ বেবাক অন্তর্ধান করছে। বুঝেছি এ ধরণের মেঘে বৃষ্টি হবে না। যদি হয় তবে হুড়মুড়িয়ে আসা কালো মেঘে—বিন নোটিসে, সন্ধ্যার দিকে। সে এখন মাথায়।

২০টায় লু উঠে (৩।৫-এর মত) ধুলোয় ধুলোয় ত্রিভুবন ধূলিতন্ত্রের তাঁবেতে গেল। বারোটা থেকে সকাল অবধি সুন্দর বাতাস। ঘরের ভিতরে শুয়েও ভোরে গায়ের চাদর খুঁজতে হল।

পদ্মার পাড়ে বাসা—আমাদের বাসা ছাড়িয়ে মাত্র দুটি কি তিনটি—পরিবারটি সিরাজগঞ্জের। বিরাট নদীর সঙ্গে এদের আশৈশব পরিচয় থাকার কথা।

তিন ভাই স্নান করতে গেছে এগারটায়। যার বয়েস বাইশ সে হঠাৎ নাকি চিৎকার করলে, 'ডুবলুম, গেলুম গেলুম।' অন্য ভাইরা মস্করা ভাবলে।

আমি যখন তাকালুম, বাড়ি থেকে, তখন ১১·৩০/১১·৩৫ নাগাদ। একটা নৌকা যোগাড় করে উড়ন জাল ফেলে ফেলে চেষ্টা করা হচ্ছিল ছেলেটাকে খুঁজে বের করার। ইতিমধ্যে গোটাতিনেক ছেলেও ডুব দিচ্ছিল—কেউ কেউ লগি পুঁতে তাই ধরে ধরে নামছিল। এদিকে ওদিকে বিস্তর ছেলে-ছোকরারা সাঁতার কাটছিল কিন্তু ডুব দিয়ে সন্ধান করার মত শক্তি ওদের নেই, কারণ ওখানে ৩/৪ লগি গভীর জল।

ইতিমধ্যে মিলিটারির দুজন লোক—একজনের মাথায় লোহার টুপি—পাড়ে এসে জুটলো। লোকজন তাদের চতুর্দিকে জটলা করলে। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলে। কিছু করলে না—করবার ছিলই বা কি?

তারপর আরেকটা নৌকা এল রাঘব জাল নিয়ে। সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হল না। তবে কি রাঘব-জাল অতখানি গভীরে তলাতে পারে না।

প্রায় একটার সময় ওপার থেকে তরতর করে দক্ষিণ বাতাসে পাটল-রক্ত রঙের পাল তুলে একটা জুড়িন্দা নৌকো আসছে দেখা গেল—আমার মনে একটু আশা হল। এরা এসে সাবধানে খাড়ির ওদিকে প্রথম দাঁড়ালো। তার পর একটা একটা করে—আসলে জুড়িন্দা নয়—দুটোই খাড়ির মুখে এসে আর পাঁচ-জনেরই মত লগির খোঁচা দিয়ে দিয়ে সন্ধান করলে।

প্রায় দেড়টার সময় আস্তে আস্তে সব চেষ্টাই বর্জিত হল। যে জেলে জাল ফেলছিল সে খাড়ির ওপারে চলে গেল। জোড়া নৌকো এবারে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধল। শুধু দু'তিনটি ছেলে তখনো মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে বাচ্চু এসে বললে, 'ছেলেটি নাটোরের। বাপের এক ছেলে (আপিসের চাপরাসী বললে বাপের নাম ডাঃ রেবতীভূষণ চক্রবর্তী), এখানে মামা

বাড়ীতে এসেছিল, সাঁতার জানত অল্পই ; পাড়ার দুই ছেলে তাঁকে নিয়ে সাঁতরাতে যায়। ছেলেটা সাঁতারে অপটু। ডুবে যাচ্ছে দেখে ওরা সাহায্য করেও ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি।

আমি শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলুম না। ও যদি খাঁড়ির মুখেই ডুবে থাকে তবে ওখানে সন্ধান বেশী না করে করা তো উচিত ছিল আরো ভাটিতে। যত কমই হোক, স্রোত তো এখানে কিছুটাও আছে।

সন্ধ্যার পর ফের লু। এখন ২৩·৪৫ কিছুটা কমেছে। তবু squalls.

পদ্মা পূর্ণিমায় তাঁর নরবলি নিলেন!

[এই সর্বনাশা রূপ ছাড়াও পদ্মার প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখক দিনলিপির এক স্থানে একটি বর্ণনা লিখে রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে সেটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল]

পদ্মা—রাজশাহী

একে উজান, তার উপর পবন যেন বান ডেকেছে ভাটার দিকে। এতে কখনও নৌকো বাওয়া যায়? তাও যায়। স্পষ্ট দেখলুম দুজনাতে কি রকম তরতর করে নৌকো উজানে ঠেলে নিয়ে গেল—লগি মেরে মেরে।

পদ্মার সঙ্গে যাদের কারবার তারা সব পারে।

সপ্তমীর রাতে পদ্মা পেরিয়ে আসছে ধুধু করে দক্ষিণ বাতাস—কখনো বা দমকা দমকায়।

আমার সামনে বিরাট পদ্মা। তার চর, চরের পর ফের নদী, তারপর দূর সুদূরের ঝাপসা ঝাপসা গাছপালা—সেও চরের উপর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে মনে হয় আমি যেন অন্তহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাতাসে জলে ধাক্কাধাক্কিতে যে ধ্বনি উঠছে সেটা ক্ষীণতর হলেও সমুদ্রগর্জনেরই মত। একই গাম্ভীর্য। সমুদ্রে যে রকম পাল পাল ঢেউ বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে, এখানেও ঠিক তেমনি নদীর স্রোতের গতিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে পূব-পশ্চিম জোড়া পালের পর পাল ঢেউ আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, আমার দিকে। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নদীর এখানে ওখানে ফেনা জেগে উঠছে—ঠিক সমুদ্রেরই মত।

এই ঝোড়ো বাতাসেও কিছুটা শীতলতা আছে বলে তার অস্থিরতা সত্ত্বেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—নদীপারে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

মনে হল, আজ আরেকটা ছোট চর ভেসে উঠেছে।

বাতাসের উল্টোদিকে পাল তুলে দিয়ে নৌকা যেতে পারে, শুনেছিলুম, বিশ্বাস করিনি। এখন এখানে সেটা স্পষ্ট দেখলুম।

স্রোত বইছে পশ্চিম থেকে পুবে, হাওয়া বইছে পুব-দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম পানে। দু'খানা নৌকো পাল তুলেছে নৌকোর সঙ্গে গা মিলিয়ে প্যারালেল—বোধ হয় উল্টো বাতাস নৌকোর ভারের সঙ্গে আড়াআড়ি আটকা পড়ে হাওয়াটার বিপরীত ধাক্কা neutralize করে দেয়। এবং তারপর স্রোতের ভাটার বেগে গন্তব্যদিকে অগ্রসর হয়। কারণ খাঁড়ির ভিতরে ঢুকেই এরা পাল গুটিয়ে নিল—কারণ সেখানে হাওয়া কম।

পদ্মার এ অদ্ভুত সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খাতায় পোকার দাগ কাটতে হবে! বিরাট অথচ ছেঁড়াছেঁড়া একটা কালো ছায়া নদীর ওপার থেকে এপারে ভেসে আসছে দ্রুতগতিতে—তার পিছনে যেন তার বাছুর, সেও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই দুটি মেঘ আকাশে খুঁজে নিতে কণামাত্র কষ্ট হয় না। পারে উঠেই যেন এরা অদৃশ্য হয়—ওদের যেন পাসপোর্ট ভিজা নেই। একেবারে মিলিয়ে যায় তা নয়। কারণ পাড়ের বালি বড় সাদা। একটুখানি আমেজ যেন থেকে যায়। V. I. Pদের বডিগার্ডের মত ভিড়ের মাঝখানে মিলেও মেশেনি।

ঐ দূরে দূরে দু'একখানি ডিঙি নৌকা। তারও দূরে চরের পশ্চিমতম কোণে লম্বা সারির খড়ের ঘর। শুনেছি পদ্মার জল গত বৎসর থেকে এপারের দিকে আসছে—আমাদের বাড়ির সামনেকার জলধারা আর খাড়ি নাকি গত বছরেও ছিল না, মাঝগাঙের চর অবধি হেঁটে যাওয়া যেত—এদের ম্যাদ তাহলে আর ক'বছরের।

ওপারের হিন্দুস্থান ভোরের বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঐ উপর দিয়ে গেল বাঘডোগরা থেকে কলকাতার প্লেন।

এপারে মহাজনী নৌকো যাচ্ছে নির্ভয়ে পুরো পাল চেতিয়ে। আরেকখানা বিনা পালেই যাচ্ছে উজান। হালের কাছের মাঝিটা পর্যন্ত নেই। কাৎ হয়ে হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণের দিকের বাতাসে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।

কাল রাত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণ ধরে গুমোট থাকার পর বইল উত্তর থেকে বাতাস। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ভিতরই তুমুল কাণ্ড। উত্তর দক্ষিণ বাতাসে লাগিয়েছে হাতাহাতি। যেন ফিরোজ আর ভজু।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৭

বাড়ির গেট বন্ধ করে যখন বেরলুম তখনো অতি অল্প হাওয়া। বিশ কিংবা পঁচিশ কদম যেতে-না-যেতেই হুড়মুড় করে যে লু ধেয়ে এল তখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এগুবো না বাড়ি যাব। নিতান্ত গোঁয়ার বলেই এগুলুম। অবশ্য গলির ভিতর ঢুকতেই অন্তত চোখ মেলে তাকাতে পারলুম।

কাজেই পদ্মাতে নৌকা চালানো যে কি হুঁশিয়ারির কাজ সেটা এ সময়ে এদেশে এলে একটা অভিজ্ঞতা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত এগারোটা অবধি এই সূক্ষ্ম ধূলোর মাঝখানে খেতে বসতে ইচ্ছে করে না।

মাইল বারো দূরে, শারদার কাছে ছেলেটির মৃতদেহ আজ পাওয়া গেছে। তাই বলছিলুম, দু'ঘণ্টা পরেও যেখানে সে ডুবেছিল সেখানে ওরা জাল ফেলেছিল কোন্ আক্কেলে।

বাপের নাম রেবতী সান্ন্যাল। বিশী যা বললে সেটা বাচ্চুর কাহিনীর সঙ্গে মেলে। তবে প্রথমটায় তার 'গেলুম, গেলুম' কেউ বিশ্বাস করেনি, পরে দুটি ছোকরা তাকে ধরেও ছিল বটে তবে বয়সে কাঁচা বলে ঝাপটাঝাপটিতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গরম অল্প কমেছে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই, কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রে এই ধূলোর অত্যাচার অসহ হয়ে উঠছে।

মেঘ রোজই সকালের দিকে আকাশের এখানে ওখানে দেখা যায়। বোধহয় শেষরাত্রে বা ভোরে যখন হাওয়া বন্ধ হয় তখন জমবার সুযোগ পায়। তারপর হাওয়া উঠে দুপুর হতে-না-হতে মেঘ হাওয়া।

মেঘের চেহারা অনেকটা আকাশের ডাবরে নীল দুধে বদখদ দখল দিলে যেরকম হেথায় জমাট হোথায় জোলো দই জমে সেই রকম!

১২ তারিখ প্রিন্স আলী খান মোটর দুর্ঘটনায় গত হয়েছেন।

জিনিসটা অত সরল নয়।

প্রথমতঃ তিনি মারা গেলে করীম—প্রতিপক্ষ দলের আর কোনো ইমাম প্রার্থী রইলেন না।

দ্বিতীয়তঃ করীমের প্রতিপক্ষ দল নিজেদের অসন্তোষ হালে প্রকাশ করছিল। তাই করীম পক্ষীয় দলের পক্ষে এই 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে,

(ক) আলী পূর্বে জানা ঠিকঠাক করা রাঁদেভুতে যাচ্ছিলেন—এলোপাতাড়ি bunmelu করতে বেরোননি। আততায়ীর পক্ষে আগেভাগেই জানা কঠিন ছিল না।

(খ) আলী অতি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যে বয়সে মানুষ par excellence গাড়ি চালায় তাঁর বয়েস সেই। চালাচ্ছিলেন ৩৮ মাইল বেগে—প্যারিসে সে কিছুই নয়, তাও রাত্রিবেলা।

(গ) তিনি ধাক্কা মারেননি। মোড় নিতেই অন্য গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়।

ঘুম থেকে উঠলুম প্রায় উনিশটায়। দেখি মেঘ জমেছে, কিন্তু সেরকম কালা ঘনঘটা নয় যা দিয়ে বোলপুরে বৃষ্টি নামে। সকালে মেঘ করেছিল কিন্তু অন্য দিনের মত দুপুরবেলা হাওয়ার জোড়ে অন্তর্ধান করেনি। আপিসের বড়বাবু বৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তারপর বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে আকাশের সর্বত্রই। মেঘও ডাকল জোর। তবু বৃষ্টি নামে না।

৮-১০এ অতি সূক্ষ্ম বারিকণা দিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মনে হল পূব-দক্ষিণে কোথাও বৃষ্টি হতে হতে এখানে এসে পৌঁচচ্ছে। অন্য দিনের তুলনায় হাওয়াও ছিল জোলো ও ঠাণ্ডা। অনেকক্ষণ পাঁয়তাড়া কষার পর বৃষ্টি এল উত্তর দিক থেকে। (ঢাকায়ও একাধিকবার এই ব্যাপার দেখেছি) তারপর আরম্ভ হল দক্ষিণ থেকে।

বিদ্যুৎ এমনই ঘন ঘন চমকাচ্ছিল যে পূর্ণ অর্ধসেকেণ্ডের তরে আকাশ একবারও অন্ধকার যায়নি। আর শিরা-উপশিরা ছড়ানো এতখানি আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ-জাল আমি ইতিপূর্বে কমই দেখেছি। আর মাঝে মাঝে রীতিমত অশনি-পাত। বলতে গেলে মনসুন 'ভাঙার' মত তোড়জোড় এবং তাণ্ডব। তবে বৃষ্টিটা সেরকম জোর নয়।

ঘণ্টা দুই পরে থামল। ধরণী শীতল হলেন।

বিজলী আলো বন্ধ হল ২১·০০। উৎপাত। খুলল ভোরে। মিলিটারি এদের ফাঁসী দিতে পারে না?

কাল রাত্রে দু'ঘণ্টা বৃষ্টির ফলেই আজ দেখি ঘাস চিকণ-সবুজ রঙ ধরেছে।

দিনটা গেল অবিশ্বাস্য আবহাওয়ায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা। ১৫·৩০-এ যখন শুতে গেলুম তখন ঘর অন্ধকার করার জন্য দোর-জানলা বন্ধ করলুম বলে পাখা চালাতে হল। না চালালেও হয়তো চলত।

উনিশটায় সেই সুন্দর ঠাণ্ডা দমকা বাতাস। সমস্ত দিন মেঘলা ছিল—এখনও তাই। অল্প বিদ্যুৎও চমকাল।

ঠাণ্ডার ঠেলায় ফিরোজের আর জ্বর নেই।

আঠারো তারিখ লাটসায়েব আসবেন। তারই প্রস্তুতির জন্য রাবেয়াকে কাল ঢাকা যেতে হবে। বিশ তারিখ (ইংরাজী) মেজ ভাই আসবেন।

ফিরোজের আবার জ্বর (২১·০০)।

আশ্চর্য! রাতদুপুরে হাওয়া বিলকুল বন্ধ হওয়াতে ঘরে মশারির ভিতর আর আরাম বোধ হচ্ছিল না। ঐ সময়টাতেই তাহলে max-heat গেল!

আকাশে চাঁদ, তারা; মেঘ নেই।

ভোর থেকে মেঘলা ঠাণ্ডা আরামের বাতাস।

বিকেলের দিকে সামান্য একটু গরম।

সন্ধ্যায় অল্পক্ষণের জন্য পূব থেকে জোর বাতাস।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে পূবের বাতাসে বিদ্যুৎ চমকালো।

তার উপর বিদ্যুতের খেল উত্তর বাগে চলে গেল। বাতাসও কালকের মত আজও রাত্রে বন্ধ হয়ে গেল। এখন (২৩·৪৫) কষ্টদায়ক না হলেও মশারির ভিতর অনারাম হবে।

রাবেয়া দুপুরের গাড়িতে ঢাকা গেল।

সাঁওতালরা পূব বাঙলার কতখানি গভীরে ঢুকেছে জানিনে। উত্তর বাঙলায় বগুড়া ও বারেন্দ্রভূমিতে তারা আছে। এখানে বাড়ির সামনে মাটি কাটার কাজ করছে।

এরা বোলপুরের সাঁওতালদের মত বুনো-বুনো নয়। দু'তিন জনে হাত ধরাধরি করে মৃদু গুঞ্জরণে গান গাইতে গাইতে এদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখিনি। বোলপুরীয়াদের মত এদের growth stunted নয়। অনেকটা তন্বঙ্গী শ্যামা বাঙালীর মত। শাড়ীও পরে হুবহু বাঙালী ঝি মেছুনির মত। গামছা আছে, কিন্তু সেটা কোমরে জড়ায়নি। এদের রঙও তৈলচিক্কন নয়। একটু যেন অপরিষ্কারও। খিল খিল করে হাসতেও এদের দেখিনি।

সমস্ত বাংলায় ভীষণ ঝড়, রাত্রে খড়্গপুরে বৃষ্টি।

ভোরবেলা থেকে ধূ ধূ প্রচণ্ড উত্তরের বাতাস। ঘরে মশারির ভিতর গায়ে চাদর জড়াতে হল। আকাশ মেঘলা। একদিকে আসন্ন বর্ষণের কালো রঙ মাখা।...

ভোর থেকেই সুন্দর দক্ষিণের বাতাস।

কখন মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে লক্ষ্য করিনি। পৌনে তিনটে নাগাদ স্নান করতে যাবার সময় দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই খানিকটে গরম আর গুমোট ছিল বলে পাখা চালাতে হয়েছিল। বাথরুমে থাকা অবস্থাতেই লু উঠলো। খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর বৃষ্টি নামল।

উত্তর দিক থেকে। কয়েকদিন আগে W. F. বলেও ছিল বটে, উত্তর-পশ্চিম থেকে ঝড় বইতে পারে।

তোড়ে বৃষ্টি। দু'একবার শিলঙের মত দু ঝাপটা বৃষ্টি মেঘের মত বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

বোধ হয় ১৫।২০ মিনিটের বেশী বৃষ্টি হয়নি—সমস্তটাই উত্তর থেকে—তবু

ঘরের মাঝখান অবধি. শুধু ভিজে যায়নি, রীতিমত জল দাঁড়াল। চৌকাঠ না থাকার ফল। বেশীক্ষণ এ রকম তোড়ে বৃষ্টি হলে ঘরে জিনিসপত্র রাখবার জায়গা থাকতো না।

রাবেয়া আজ ফিরল না কেন বুঝতে পারলুম না।

সন্ধ্যায় পদ্মার জল অদ্ভুত অলিভগ্রীন হল।

এখনও বেশ মোলায়েম ঠাণ্ডা। অতি মৃদু দক্ষিণের বাতাস (০০·৩০), তবে দু'চারটে মশার ভনভনানি কানের কাছে।

আজও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হল। এ কদিন রাতদুপুরে হাওয়া বন্ধ হত। আজ আর তা হল না। পরদিন সকাল পর্যন্ত সুন্দর হাওয়া ছিল।

দুপুরবেলা খুব ঘন মেঘ জমল।

খুব হাঁকডাক। এন্তের জাঁক দেমাক। বুঝি আকাশ ফেটে পড়বে।

আধ আউন্স শিলাবৃষ্টিও হল।

তার পর তিন আউন্স বৃষ্টি। সেও পূর্বদিনের মত উত্তরের বাতাসে জলকণা।

তারপর হাওয়া বন্ধ।

এখন (১৯·৪৫) সুন্দর বাতাস।

পূবের বাতাস যখন বইছিল তখন পশ্চিমের স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পদ্মার বুকে যা সাদা ফেনার ঢেউ জাগালে, তাও আবার এমন chopped যে সে এক প্রলয় কাণ্ড।

বৃহস্পতিবার সকালের বসুমতী লেখে :—

…"অন্ততঃ আবহাওয়া অফিস বুধবার রাত্রে যে পূর্বাভাস দিয়াছেন তাহাতে অদ্য বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টি হইবার কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ তো নাই, বরঞ্চ বলা হইয়াছে যে, অদ্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকিবে ও দিবাভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে।"!

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কলকাতায় কালবৈশাখী, সামান্য বৃষ্টি। সেই যে গেল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর কষ্টদ গরম পড়েনি। ফৈজু ভাই ঠিকই বলেছিল, একবার বৃষ্টি হলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম, শান্তিনিকেতনের মত উটকো বৃষ্টি হয়ে ফের গরম পড়বে। তা হল না, Thank God—touch wood ! So far.

আজও বেশ ঠাণ্ডা। দিনে একবার ঝড় উঠেছিল। রাত্রে ২২টা নাগাদ অল্পক্ষণ সামান্য বৃষ্টি হল। এখন ০০·৩০-এ সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর গুরুগুরু মেঘ ডাকছে—যেন খাঁটি বর্ষাঋতু। অতীব রমণীয়।

তারপর নামল তুমুল বেগে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি। আর ঝঞ্ঝার বাতাস।

একেবারে খাঁটির খাঁটি বর্ষা।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা in Bonga from 64·5 to 7·30 in the morning.

সকাল থেকে রীতিমত ঠাণ্ডা বাতাস।

সমস্ত দিন মেঘলা আর ঠাণ্ডা। দুপুরবেলাও শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকা যায় না। সকালে তো ড্রেসিং গাউন পরেই কাটাতে হল।

সমস্ত দিনটা গেল খাঁটি বর্ষাঋতুর মত।

রাত প্রায় দশটা থেকে কী বিদ্যুতের খেলা। বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

গেল রাত্রির বৃষ্টিতে আকাশ থেকে শেষ ধূলিকণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বলে আজ সকালে দূরের চরের—মনে হয় ওপারের—গাছপালা পরিষ্কার ঘনশ্যাম দেখাচ্ছিল। দেশে ধানক্ষেতের ওপারের গ্রাম যে রকম দেখায়। দূর-দূরান্ত অবধি অবাধ দৃষ্টি ধেয়ে গিয়ে যা-কিছু দেখবার সব দেখা যায়। নদীর বড়ধারা যেখানে শূন্যে লীন হয়েছে—বালুচরের উপর যে কটি সবুজ ঘাস রাতারাতি গজিয়েছে। স্বচ্ছ—একেবারে স্বচ্ছ। মনে হল আমার চোখের উপর যে চামড়ার পরদাটা রয়েছে সেটাকেও যেন কাল রাত্রের বৃষ্টি ধুয়ে পুঁছে ঝকঝকে স্বচ্ছ সাফ করে দিয়ে গিয়েছে।

রাবেয়া সকালে পাবনা গিয়েছিল, সন্ধ্যায় ফিরে এল।

মাইজম ভাইসাহেব কাল ও আজ রাত্রে এখানে খেলেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কী শীত, কী ঠাণ্ডা! সমস্ত রাত বৃষ্টি হয়েছে নাকি? এখন তো ধমকে ধমকে বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসছে উত্তর দিক থেকে (৭·৩০)। যেন ভরা বর্ষার ভোরের বৃষ্টি।

এই আজ প্রথম নদীতে স্নানার্থিনী নেই। একটিও না।

তবু তো স্নান এ দেশে fetish—necessity না হলেও। বৃষ্টি থামতেই সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই দু'তিনটি রমণীর আবির্ভাব। ওদিকে যে পোলটা তৈরী হচ্ছে তারও মজুররা কাজে লেগে গিয়েছে।

তিনজন জেলে উড়োন জাল ফেলে মাছ ধরছে। অন্যদিন এ সময়ে ধরে না। বোধ হয় গরম বলে এতক্ষণে মাছ জলের গভীরে ডুবে যায়—যেখানে জাল পৌঁছয় না।

দূরদূরান্ত অবধি কী সুন্দর পেলব ধরণী। বাতাস মাঝে মাঝে যখন গতিবেগ কমায় তখন বিশাল পদ্মার উপর যেন ছোট ছোট নাগ-নাগিনী ক্ষুদে ক্ষুদে ফণা তোলে। দূরে চরের সদ্যজাগা কচি সবুজের প্রলেপ দিয়েছে সবে-গজা ঘাস। তার পিছনে প্রাচীন গাছপালার ঘন সবুজ। তার পিছনে কাজল-নীল আকাশ।

সেই যে তের তারিখে বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর গরম পড়েনি। সেই অতি সূক্ষ্ম ধূলিতন্ত্রেরও অবসান হয়েছে।

সমস্ত দিন মেঘলা আকাশ। আসন্নবর্ষণ না হলেও চেহারা বর্ষাকালেরই মত। সর্বাঙ্গসুন্দর নিম্বাস (Nimbus) না হলেও ঐ গোত্রেরই বটে। আকাশের কোনো কোনো জায়গা যেন নীলাঞ্জন-লিপ্ত। শুধু মাঝে মাঝে সাদা সাদা ভাব—কাজলটা যেন জলের সঙ্গে ঠিকমত লেপা হয়নি। আবার সমস্ত উত্তর আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ পাক-খাওয়া-খাওয়া কালোয় ধূলায় মেশানো সেই বনসঙ্কর নিম্বাস।

শেষ বালুকণা আকাশ থেকে বিলীন হয়েছে বলে ওপারের হিন্দুস্থান দেখা যাচ্ছে। আমার শালীর ছেলের বয়স ১৫।১৬, সে কত অনায়াসে বললে, 'ওপারে? ওপারে ইণ্ডিয়া।'

এই জেনারেশনের কাছেই পরদেশ 'ইণ্ডিয়া'। প্রার্থনা করি, তার পরের জেনারেশন যেন ইণ্ডিয়াকে মিত্রের চোখে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই দেশ যদি ঠিকমত সহযোগিতা করে তবে চীনকেও সর্বক্ষেত্রে হারাতে পারবে।

কাল রাত্রে হাওয়া বন্ধ ছিল। পাখা না চালিয়েও খুব কষ্ট হয়নি।

সকালে আকাশ মেঘহীন ছিল। ক্রমে দক্ষিণের বাতাস মেঘ জমাতে আরম্ভ করল। Cumulus—Nimbus-এর দোআঁশলা। দক্ষিণের বাতাসটি গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকাতে শুক্র শনি রবিতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে 'সংবাদ' উল্টো গান গাইছে।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলছেন, ক্যালেণ্ডারের একই দিনে বৃষ্টি হয়। যদি অন্য সময় বেশী বৃষ্টি হয় তবে সে আকাশে মেটেওর-ফেটেওর কি সব কারণে।

আমার ক্যালেণ্ডার তো তা বলে না। তবে কি অন্য Geo-physical Calender রয়েছে?

দিল্লী থেকে সংবাদদাতা লিখছেন, ভারত পাকিস্তানে entente cordial বাড়ছে। সাধু!

সন্ধ্যায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট। আকাশেও মেঘ নেই। রক্তাক্ত সূর্যাস্ত।

এই কি ফের গরম আরম্ভ? Pre-monsoon গুমোট?

রাবেয়া পাবনা গেল। কিসের যেন মুখপোড়ার Pre-census.

Birthday of রাসবিহারী বসু। আশুতোষের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী।

নজরুল্ ইসলামেরও জন্ম ১৩০৬ সালে।

কাজী আমিন উল্লা	মুনশী তুফায়েল আলী
„ ফকীর আহমদ	মুসম্মৎ Zaheda খাতুন
„ নজরুল ইসলাম	

তাঁর পিতৃব্য কাজী বজল-ই-করীমের কাছ থেকে নজরুল ইসলাম বিস্তর ফার্সী

শোনেন। আত্মীয়েরা তাঁকে দুখু মিয়া ডাকত, অন্যেরা 'ক্ষ্যাপা'। আসানসোল বেকারি। কাজী রফীকুদ্দীন সব্‌ইন্‌স্‌পেকটর অব পুলিস তাঁকে কাজীর সিমলা (Kazir Simla) গ্রামে (মৈমনসিংহে) পাঠান। সেখানে তিনি class X অবধি ওঠেন। ১৩২৯-এ ত্রৈসপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত। ২৩ বছর বয়সে ১ বছরের জেল। ৩৯ দিনের অনশন। আব্দুল্লা সুহ্রাওর্দীর অনুনয়ে অনশন ভঙ্গ—he carried a message from the nation requesting him to do so—Mrs. M. Rahman took charge of him—বিয়ে, আশালতা সেন (পরে নাম প্রমীলা)—কুমিল্লার মেয়ে—

সকাল থেকে গুমোট। ভাবলুম, এই বুঝি শুরু হল ফের গরম।

দুপুরে পাখা চালালুম। অবশ্য সবসুদ্ধ তেমন কিছু পীড়াদায়ক নয়।

সন্ধ্যা ছ'টায় ঘনঘটা করে এক মিনিটের জন্য দক্ষিণ থেকে ফাইন বৃষ্টি।

এখন অতি ফিনফিনে বৃষ্টি পূব থেকে (১৯'১৭)। ঠাণ্ডা। আরামদায়ক।

বিশীর বাড়ি থেকে রাত্রে ফিরে ঘরটা গরম বোধ হল।

রাত্রে দোমনা হয়ে শুলুম, গুমোটই, পাখা না চালিয়ে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। ছাত ভেজা।

কলকাতায় বর্ষাকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও দু'এক পশলা বৃষ্টি। Main monsoon proceeding to Calcutta.

সকালে চড়চড় করে গ্রীষ্মের রোদ উঠল। ভাবলুম, খেয়েছে, আমাদের ঠাণ্ডার হনিমুন শেষ হল।

তারপর কোথা থেকে ঘন মেঘ জমতে আরম্ভ করলো—যদিও ঠিক বর্ষণদ নয়। আর ধূধূ বাতাস। কাঁচের দরজা বন্ধ করে বসতে হয়েছে। কোদাল কাটা পদ্মায় সাদা ফেনা। গাছপালা, মেয়ে-মদ্দের শাড়ী ধুতি হেন বস্তু নেই যা শান্ত থাকতে পারে। চানের ঘাটেও হৈ-হৈ—জনা পঞ্চাশেক প্রচুর তোলপাড় করে স্নান করছে।

আর পূর্ব দিগন্তে মেঘে, জলে, বালুচরে কী অপূর্ব রহস্যময় সমন্বয়ে সব-কিছু পেলব করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দু ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা।

তারপর অনেকক্ষণ হালকা পাতলা বৃষ্টি হল—প্রায় ঘণ্টা-দেড়। বিদ্যুৎ না, মেঘের ডাক না। হাওয়া এখনও বইছে। তবে জোরটা কমেছে।

নারকোল গাছ এখানে সর্বোচ্চশির। কখনো মনে হয় windmill, কখনো বা আনাড়ি হাতে তৈরী দশভুজার মূর্তির মত।

দিনটা সুন্দর গেল। সন্ধ্যায় মেঘলা ছিল বলে ঈদের চাঁদ দেখার কোনো প্রশ্নই উঠলো না।

কত না দৃশ্য দেখা যায় এখানে ঝড় উঠলে।

খাড়ির ভিতরে দুখানি জালি বোট এবং আর সব নৌকো নিশ্চিন্ত। খাড়ির বাইরে কুণ্ডের বাইরে ছিল মহাজনী নৌকো—বালুভর্তি। সে খাড়ির ভিতর আশ্রয় নেবার জন্য রওয়ানা দিলে। একজন জল সেঁচচে—একজন হাল ধরেছে, আর দুজনা জোর বৈঠা চালাচ্ছে। ভাটাতে যাচ্ছে বটে কিন্তু পূব-দক্ষিণের হাওয়া বলে তাকে পুরো লড়াই লড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে হলো। খাড়িতে ঢুকে নিষ্কৃতি।

মাঝ-নদীর চর থেকে আসছে আরেকখানা মহাজনী। ওখানে হাওয়ার থেকে কোনো আশ্রয় নেই। হয়তো বা নৌকোতে বালু। সে যদি পুরো ভেজে তবে নৌকো ডুবিয়ে দেবে। তাই এই ঝড় মাথায় করে পূবের বাতাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে এল। খাড়ির মোহনায় পৌঁছতে এতই বেগ পেতে হয়েছে যে সেখানে পৌঁছনো মাত্রই একজন রশি হাতে মাটিতে নেবে বাকিটা টেনে নিয়ে এল।

কিন্তু আশ্চর্য, আরেকখানা নৌকা মাঝগাঙে দাঁড়িয়ে—এদিকে আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ওর কি ডর-ভয় নেই। ঝড়ের বেগ তো আরো বাড়তে পারে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, মাল্লাদের ভিতর কণামাত্র দৌড়ঝাঁপ বা অন্য কোনো প্রকারের উত্তেজনা নেই। লড়ালড়ি যুঝাযুঝি সব করে যাচ্ছে অতিশয় আটপৌরে চালচলন সহ। হৈ-হুল্লোড় করলে পুল তৈরীর জন তিরিশেক মজুর।

বেতারে সতর্ক বাণী দেওয়ার এক দেড় ঘণ্টার ভিতরই বৃষ্টি আরম্ভ হল। অবশ্য মেঘ জমতে আরম্ভ করেছিল সকাল থেকেই। ভোরে রৌদ্র ছিল। হাওয়া বইল দুপুর অবধি উত্তর থেকে। অথচ বৃষ্টি আর ঝড় এল পূব এবং দক্ষিণ থেকে।

এখন ঝড়ের দাপট কমেছে। ঘাট পাড় জনশূন্য। পুলের মজুর সব অন্তর্ধান করেছে। নৌকোর ভিতরে মাল্লারা আশ্রয় নিয়েছে। গয়লানী তুফানের শুরুতেই গাই দুটো ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, এখন ঘুঁটে সরাচ্ছে। ওপারে নৌকোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে (ওখানে বোধ হয় চড়ার কাছে বলে জল কম) এবং এই বৃষ্টিতে দুটো বাঁদর ছোঁড়া সাঁতার কাটছে। বোধ হয় সেই প্রবাদটা শুনেছে, 'এমন সুবুদ্ধিমানও আছে যারা বৃষ্টির হাত থেকে এড়াবার জন্য পুকুরে ডুব দেয়।'

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি (১৭·৩০), জোর বৃষ্টি হচ্ছে। যখন অল্পক্ষণের জন্য থামল তখন দেখি, বাগানে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে—ওবেলা যে রকম দাঁড়িয়েছিল। দিনে দু'বার এরকম ধারা পূর্বে হয়নি।

এখনও খাঁটি বর্ষাকালের পিটির পিটির চলছে।

কেউ বলবে না এটা গ্রীষ্মকাল।

এরকম আর কয়েকদিন চললেই তো এ বৃষ্টি মৌসুমী বৃষ্টির সঙ্গে মিলে যাবে। কারণ খবর এসেছে মৌসুম বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

এখন অবধি চলেছে বর্ষার মত। কখনো পিটির পিটির; কখনো দমকা হাওয়া। বাতাস একেবারে বন্ধ কখনো হয়নি। বিদ্যুৎও কম। যেটুকু তাও দূরে দূরে। বেতারকেও ব্যাঘাত করে না।

যেন খাঁটি বর্ষা ভোর।

একটুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে ওপারের গাছপালা ঝাপসা হয়ে দেখা যাচ্ছে। নদীঘাট জনহীন। মাত্র দুটি মেয়ে মুখোমুখি হয়ে কোমরজলে শীতে জবুথবু-প্রায় দাঁড়িয়ে—অন্যদিন তারা তলওয়ারের মত খাড়া হয়ে ভীষণ বিক্রমে সর্বাঙ্গ মর্দন করতো—মাঝখানে একটা উপু কলসী ভাসছে। কাছে কাছেই দু' একটা শিশুক এসে জুটেছে। কাল সন্ধ্যায় একখানা জালিবোট ফিরে এসেছে। তার নবদ্বার বন্ধ। পাড়ে ছাতা মাথায় একটি লোক কোনো গতিকে পা টিপে টিপে নিচের দিকে নামছে। পোলটার মেরামতি হচ্ছে বলে ঢালু পাড়ির অনেকখানি নেমে ফের চড়ে সড়কে উঠতে হয়।

অতি সূক্ষ্ম বারিকণা ঐ ওপার হিন্দুস্থান থেকে ধেয়ে আসছে। ভুল বললুম, আস্তে আস্তে সব কিছু ঝাপসা করে দিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন পাহাড়ে

কুয়াসার পর্দা এগিয়ে আসছে। এখন এসে পৌঁচেছে স্নানার্থিনীদের কাছে। বালুচর, ওপারের বনরাজি দেখা যাচ্ছে না—যদিও দূরত্বটা বোঝা যাচ্ছে। নদীর মাঝখানে অতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাল ঝড়ের সেই দুঃসাহসী দুঁদে-নৌকোটা। ভূতুড়ে, ফ্যানটম বোট যেন।

এ-ছবি জাপানীরা আঁকে চমৎকার।

আবার জোর দমকা হাওয়ায় মেশানো বৃষ্টি। সমস্ত দিন কাটলো ঝোড়ো বৃষ্টিতে—মাঝে মাঝে থেমেছিল বটে। এসেছে সর্বক্ষণ উত্তর দিক থেকে এবং এমনি ট্যারচাভাবে যে উত্তরের চওড়া বারান্দা ভেজা—শুকোবার ফুর্সৎ পায়নি। অথচ ঝড় সাইক্লোন তো আসবার কথা দক্ষিণ থেকে।

সেটাই বোধ হয় এল এখানে ২০'০০। খুলনা থেকে এখানে আসতে লেগেছে প্রায় ছ'ঘণ্টা। এখন একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। তবে যে বেগে হঠাৎ এসেছিল, সেই বেগেই চলছে—বাড়েনি এখনো (২১'০০)। ঝড়ের গোঙরানোটা কিন্তু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বৃষ্টি খুব নয়। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না।

বর্ধমান—চারদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর ও মাঝে মাঝে বৃষ্টির পর কাল রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি।

২৮।৫ | অদ্য সিউড়িতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ। শুক্রবারেও হয়েছে।

কাল ২০'০০ থেকে এখন ৮'৩০ নাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি—যদিও জোর নয়—আর ঝোড়ো বাতাস। বাতাস আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। কেন জানিনে বিজলির 'ফ্যুস' এত লাফাচ্ছে যে রেডিয়ো খুললেই এত শব্দ হয় যে কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। এই জলঝড়ে রাবেয়া পাবনা থেকে আসবে কি করে?

উজানে বর্ষা না নামলে নদীর জল বাড়ে না। কিন্তু এই লোকাল বৃষ্টিই পদ্মার জল বেশ বাড়িয়েছে। ভাটির দিকে হাওয়া বইছে বলে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খাওয়াতে পদ্মার বুকে তেমন তরঙ্গ উঠছে না—কিন্তু যা উঠছে তাও এর পূর্বে কখনো দেখিনি।

বাসুর বিশ্বাস, এটাই মনসুন। কি করে হয়?

বর্ষাঋতু চলল ১৫'৩০ অবধি। তার পর ঘুমুতে গেলুম। ১৭ নাগাদ উঠে দেখি সব কিছু শুকনো, হাওয়া বন্ধ; বর্ষার ভাব পুরো কেটে গেছে। তবে

আকাশ মেঘলা, যদিও তার ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা গেল। চতুর্থী কি পঞ্চমী। পাবনা অঞ্চলে বোধ হয় বাস্ ছাড়ার সময় অবধি বৃষ্টি ধরেনি। বউ তাই আসেনি।

নৌকোগুলো ফের খাড়ির মুখে জড়ো হয়েছে। নদীপারে সন্ধ্যায় ফের জনসমাগম। এখনও বৃষ্টিহীন অল্প গুমোট আবহাওয়া। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।

সন্ধ্যার পর আমার অল্প—যদিও অতি অল্প গরম বোধ হচ্ছিল।

নটায় অতি সুন্দর মলয় বইতে লাগল। এখনও (০১·০০)।

এই দিনেই শান্তিনিকেতনে ৪·৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। Highest of the month according to V. B. Bulletin.

সকালবেলা শুকনো—যেমন তেমন।

দুপুরে ভ্যাপসা পীড়াদায়ক গরম। পাখা চালিয়েও শান্তি নেই। একদিনেই হেন পরিবর্তন! রাজশাহী গরম জায়গা—by nature.

বউ ফিরেছেন।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে গুমোটে ফের কষ্ট। যদিও হাওয়া অল্প-স্বল্প ছিল। ঠাণ্ডা হতে হতে বেশ সময় লাগল। এখন ০১·০০ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় বেতার বললে, রুশিয়া স্পষ্ট বলেছে, যে সব আড্ডা থেকে বিদেশী প্লেন গুপ্তচরী করতে রুশ আকাশে উড়বে সে সব আড্ডার উপর বোমা ফেলা হবে। আরো বললে, এসব প্লেন যেন না ভাবে, তারা এমন উপর দিয়ে উঠতে পারবে যেখানে তাদের রকেট পৌঁছতে পারে না।

শাবাশ্! এইবারে তাহলে পাকাপাকি পাঁয়তাড়া কষা আরম্ভ হল। কিন্তু এসব কথা শুনে তো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। রুশে মার্কিনে লড়ুক না, কিন্তু আমাদের নিয়ে কেন টানাটানি?

আরেকটা প্রশ্ন, ওদের রকেট যদি সব কিছুই যত উপরেই হোক না কেন নষ্ট করতে পারে তবে হাওয়াই আড্ডা ধ্বংস করার হুমকি কেন? ওদের মেরে ফেললেই পার। আমার মনে হয় পারে না। আর ঐ যে মার্কিন বিমান ভেঙেছে ওর চালক কম্যুনিস্ট।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কালকের মতই দিন গেল। চতুর্দিক থেকে ফোরকাস্ট-ও হয়েছে যে বৃষ্টি কমবে। আজও তাই কালকের মত শুকনো গেল। গরম, কিন্তু অসহ্য নয়। কালকেরই মত সন্ধ্যা থেকে ধূ ধূ হাওয়া।

সকালে চারবার দাস্ত হল। মাছের ডিম খেতে নেই। মনকে একাধিকবার বুঝিয়েছি।

আকাশ এত পরিষ্কার যে শরৎকালের মত তারা সব জ্বলজ্বল করছে। ছায়াপথ দেরিতে ওঠার পর তাকেও অতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাটার সমুদ্রের মত পদ্মা কখনো গর্জন করছে জোর, কখনো ক্রন্দন খানিকটে কমিয়ে দিচ্ছে।

এত হাওয়া—সে শুধু একেবারে পদ্মার বুকের উপর খাড়া এই বাড়ির কল্যাণে। সে-কথা একাধিক লোক আমাকে বলেছেন।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। সমুদ্রপারেই বলো আর এখানেই বলো, ধূ ধূ হাওয়ার মাঝখানে মন যেন শান্তি পায় না, কোনো কাজে পুরোপুরি concentrate করা যায় না। একদিকে গায়ে ক্রমাগত হাত বুলোচ্ছে, অন্যদিকে কানের কাছে শব্দ করছে—একসঙ্গে দুটো disturbance

এ ক'দিন গরম ছিল ভ্যাপসা। ঘামও হচ্ছিল। বোধ হয় আজ তাই সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে, এই মিনিট দশ আগে (৮·৩) অতি সূক্ষ্ম এক পশলা বৃষ্টি এক মিনিটের তরে হল। তারপর দূর দূরান্ত অবধি সেই পাতলা জলকণাযবনিকা ঢাকা মাঝনদীর চর, ওপারের সবুজ রেখায় বিলীয়মান জনপদভূমির তরু-বনানী, আকাশের দিগ্বলয়প্রান্ত শ্যাম কাজলে মসীমাখা।

আবার পূবের বাতাস—এতদিন ছিল দক্ষিণের। তারই জোরে মহাজনী নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে। এদের গতি এতই মসৃণ আয়াসহীন যে এর কাছে রাজহাঁসও হার মানে।

এরই মাঝখানে দেখি, আকাশ-ভরা মেঘের এক জায়গায় অতি ছোট একটা চক্র—তার ভিতর দিয়ে ট্যারচা হয়ে সূর্যরশ্মি পড়েছে শুভ্র বালুচরের উপর—আর সে রশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল মেঘের, নীল আকাশের উপর। বালুচর যেন আতশী কাচ হয়ে সূর্যের সঙ্গে চোখ-ঠারাঠারি করছে।

এইবারে রাক্ষুসী পদ্মা ধরেছেন জেব্রার ঢং।

আকাশের অনেক জায়গায় মেঘ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ফালি ফালি ডোরা ডোরা হলদে পদ্মার জল, আর অন্য জায়গায় নীলের ডোরা। সেই 'পরশুরামে'র দক্ষিণরায়, মোশয়, ডোরাডোরা আঁজি আঁজি!

শান্তিনিকেতনে যে রকম নিত্য নিত্য আবহাওয়ার চার্ট রেখেও এত বৎসর পরেও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারিনে, এখানেও তাই। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে ডিপ্রেশন হয় এবং ফলে ঝড়বৃষ্টি হয় (যদি সত্যই তাই হয়) তার কোনো হদিস আগের থেকে পাওয়া যায় না।

গত বছর অনেক দেরি অবধি বর্ষা চালু থেকে বন্যা ঘটালে।

শান্তিনিকেতনের মাটি ভেজা রইল অনেকদিন। কিন্তু শীতের বৃষ্টি, যেটা প্রতি বৎসরের পাওনা, হল না। এমন কি পূব বাঙলায়ও না—বেশীর ভাগ জায়গায় সাত মাস ধরে বৃষ্টি হয়নি।

জোর ঝঞ্ঝা ঝড় হওয়ার কথা বৈশাখ মাসে। হল না। হল ৩০শে বৈশাখে। সেটা আবার চলল একটানা ২৯।৩০ অবধি। সচরাচর কি এরকম হয়?

তার পর এখনো ঠিক গরম পড়েনি। পশ্চিম বাঙলা অন্তত ২৬ তারিখ অবধি ঠাণ্ডা ছিল।

ইতিমধ্যে কলকাতা একদিন বললে, মনসুন বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আসছে। তারপর চুপ।

এখন প্রশ্ন সত্যকার আসল বর্ষা নামবে কবে?

এসব অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে পেছিয়ে যাবে, না মাঝ-জুনে যথারীতি নামবে।

তেরো তারিখে বৃষ্টি নামার পূর্বে দিনকয়েক যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট করেছিল তা নয়। কাজেই আজকের দিনের জোর হাওয়া দেখে বলা, যে বৃষ্টি হতে অনেক দেরি এটিও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ।

সুন্দর বাতাসে ভোর আটটা অবধি সুনিদ্রা।

পদ্মার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি এক রাত্রেই ডুবে ডুবে অনেকখানি জল

খেয়েছেন। কুণ্ডের একটা পাশ ডুবে গিয়ে এখন স্রোতের ধারা প্রায় পাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল। ছোট্ট চরটি সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করেছে।

আকাশে ভালো করে মেঘ জমেছে। বর্ষা-সকালের আবহাওয়া।

খাড়ির সব-কটা নৌকাই যেন একে একে পাড়ি দিয়েছে উজানের দিকে পশ্চিম পানে। তাদের গতি এমনই মসৃণ পিচ্ছল অনায়াস যেন পাকা স্কেটিঙের সর্দারনীর বুক ফোলানো প্রফাইল দেখতে পাচ্ছি পারের থেকে।

এই দেখে মনে পড়ল, আমাদের দেশে যখন কোনো নৌকো পাল তুলে তর তর করে উজানে ধায়, আর দেখে অন্য কোনো নৌকো পাল নেই বলে বৈঠা মেরে মেরে অবিরাম ঘামছে তখন চেঁচিয়ে বলে, 'হালের বলদ বন্ধক দিয়ে পাল কেন।'

কত গরীব আমাদের দেশ! সামান্য একটুকরো কাপড় কেনার পয়সা নেই।

রাত সাড়ে দশটায় লু আরম্ভ হল। উত্তর দিকে দূরে দূরে মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শব্দহীন। আকাশেও মেঘ নেই। আজ ধুলো কম। না হলে এই বাতাসেই আমরা ফের ধূলিতন্ত্রের অধীন হতুম। বৃষ্টির আশা কম। কালকের তুলনায় আজ ভ্যাপসা ছিল কম।

ঘণ্টাখানেক এই লু উৎপাত করে চলে যাওয়ার পর এখন (০১'০০) হাওয়া একদম বন্ধ। কী উৎপাত। কাল এই সময় কি হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে হাওয়া আসছিল।

আজ সকালে স্নানের ভিড়। দশেরা? এ-সময়ে দশেরা কি রে বাবা? আজ দুপুর এবং এখন (১৮'৪০) সত্যই গরম। ভ্যাপসা, ধুলো, দক্ষিণের হাওয়া নেই। পূবের হাওয়া এখানে ঢোকে না। পদ্মা চলছে বোঝা যায় তার শব্দ থেকে—হাওয়া থেকে নয়। 'জ্যুস' শেষপ্রান্তে।

আজ কত রকম আবহাওয়াই না যাচ্ছে।

সন্ধ্যায় ছিল গুমোট। তারপর সন্ধ্যাবেলাতেই পূবের বাতাস। তার পর পূব-দক্ষিণ থেকে ধূ ধূ হাওয়া। দরজার একটা পাটি বন্ধ করে দিতে হল; না হলে কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘ ছিল অল্প—তাও খুব বর্ষণপ্রদ নয়, লম্বা লম্বা ফালি ফালি। তারপর অসহ্য গুমোট। হাওয়া এমনই মোক্ষম বন্ধ হল—

এরকম ধারা জীবনে কখনো দেখিনি—যে বেশ কিছু মশা সর্বাঙ্গের চতুর্দিকে ভন ভন করে অস্থির করে তুললো। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক। ঠিক বৃষ্টি হব হব ভাব। তারপর হঠাৎ জোর বাতাস ধূলিতন্ত্র। নিরাশ হয়ে দোর জানলা পর্যন্ত বন্ধ করলুম না।

এই হাওয়া-গুমোটের তামাশা ক'বার হয়েছিল জানিনে।

শেষ রাতে অনুভব করলুম, বৃষ্টি হয়েছে। সকালে দেখি ছাত বেশ ভেজা।

সকালে দেখি ছাত ভেজা। অল্প অল্প বাতাস। তাতে ধূলিকণার অত্যাচার কম। এখন ৫ ৫৫-এ ঢাকা ফোরকাস্ট দিলে আজ চাটগাঁ, দক্ষিণ ঢাকা ও দক্ষিণ রাজশাহী বিভাগে ঝড়-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি তাবৎ কিছুই হবে। এই মুহূর্তে এখানে নিদারুণ গুমোট, বাবলাগাছের বিন্দুপারা পাতাটিও নড়ছে। বৃষ্টি হলে বাঁচি। তবে ঈদের বাজারের সর্বনাশ হবে।

ঈদ

আজ আবার নীল চাঁদ দেখলুম। এই নিয়ে জীবনে তিনবার। আর দু'বার বছরের ঠিক এই সময়েই দেখেছিলুম। এবারে ব্লু, কিংবা fine emareld green.

আজ চাঁদের শুক্লা দ্বাদশী। সূর্যাস্ত এখানে—রাজশাহীতে—আজ ১৮'৫২-তে। দেখলুম ঠিক ১৯'০০। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই চাঁদ সোনালী হয়ে গেল। বোধহয় অন্ধকার বাড়ল বলে, চাঁদের জ্যোতিও বাড়ল। তাই সবুজ-নীলত্ব লোপ পেল। ১৯'৫৫-এ নিত্যিকার চাঁদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন মেঘ তখন আকাশ ও চাঁদের গায়ে। এমন কি তখনও সূর্যাস্তের লালিমা আকাশের হেথা হোথা লেগেছিল।

আজ সকালে উঠে বুঝলুম, কালকেরই মত বৃষ্টি হয়েছে।

বেতার বললে, ঢাকাতে বৃষ্টি সত্ত্বেও নমাজের জনসমাগমে মানুষ কম হয়নি।

দিনটা মোটামুটি গরমই। তবে এখন ২২·১৫ হাওয়া বইছে। সন্ধ্যা থেকেই পূব থেকে ছিল। বর্ষা কাছে আসার সঙ্গে পূবের বাতাসের প্রাধান্য বাড়ছে।

কালকের চাঁদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম বলে এবং visitors ছিল বলে নীল চাঁদ দেখার চেষ্টা করিনি। দুঃখ হচ্ছে।

সাঁওতাল রমণীর বর্ণনা—শান্তিনিকেতন।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে চুলে তেল দেয় না।

খোঁপা কি আমাদেরি মত বাঁধে?

পরণে কমলা রঙের শাড়ী—বেগনী পাড়।

ডান হাতে বাজু বন্ধ।

গলায় সাদা পুঁতির হার।

কানে পেতলের সাদাসিধে গোল একটি কানফুল—just a big full stop।

ডান হাতে সুতো বাঁধা—ওতে কি কবজ?

RAJSHAHI—CALCUTTA

ফিরোজ ভজু স্টেশনে এসেছিল। তাদের মুখ শুকনো। থাক্ সে আমি বলতে পারব না।

বউ ঈশ্বরদী অবধি এল। আমাদের বগিটা অনেকক্ষণ ধরে শানটিং করলে।

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন হানিমুনে। বউ ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী ঐ ঢাকা এই পাবনা একাধিকবার বাসে করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত দেড়টার সময় আমার গাড়ি ছাড়ল। সেও শুকনো মুখে বিদায় নিল।

এ বড় পীড়াদায়ক। এসব কথা আর লিখব না। এ তো কাল্পনিক পীড়ার জাল বুনে বুনে উপন্যাস লেখা নয়।

সমুদ্র-প্রকৃতি

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা চওড়া কালো রাস্তা। তারি সঙ্গে গা মিলিয়ে একফালি ঘন সবুজ মাঠ, ছোঁড়ারা ক্রিকেট খেলে—তার সঙ্গে গা মিলিয়ে ফের আরেক ফালি সোনালী বালু পাড়—এক পাশে জেলেদের বস্তি, গাছ নেই পালা নেই কতকগুলো কুঁড়েঘর—বালু পাড়ির সঙ্গে গা মিলিয়ে আরেক ফালি লম্বা একটানা নীল সমুদ্র।

চোখে পড়ে চার ফালি কালো পথ, সবুজ মাঠ, সোনালী বালু আর নীল সমুদ্র। নীল হল কথার কথা। তা না হলে দিনে যে সুন্দরী কবার কাপড় বদলাল তার হিসেব রাখা দায়—বাকি তিনজন কুঁড়ের বাদশা, তাদের রঙের ফেরফার হয় না।

সমুদ্রের এক দিকটা গিয়ে লেগেছে আডিয়ার নদীর মোহনায়। দুইজনের ধাক্কাধাক্কিতে টক্কর খেয়ে একটা ঝিল তৈরী হয়েছে,—সে এঁকেবেঁকে আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে—জেলেদের গাঁ ছাড়িয়ে। ঝিলটা নিতান্তই খরা, তার উপর নৌকা চলে না, জেলে জাল ফেলে না, তার রঙেরও অদল বদল হয় না। তবু এঁকে বেঁকে গেছে বলে মাঠ, বালু সমুদ্রের ফালি কেটে সব জিনিস যেন দূরে নিয়ে গিয়েছে।

*　　*　　*

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সকালবেলা দেখি বালুপাড়ের গায়ে যেন কে নীলাম্বরী শাড়ী শুকুতে দিয়েছে। আলোআঁধারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে দক্ষিণের বারান্দায় পূবের রোদ এসে পড়েছে, নিমগাছের ফাঁকে ফাঁকে। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইলুম। মন বোধ হয় শান্ত ছিল তাই কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। বেলা যখন বেশ হয়েছিল তখন দেখি পূবের রোদটুকু বারান্দাটি যেন মুছে দিয়ে চলে গেছে।

ওদিকে দেখি নীলাম্বরী শাড়ীর উপর রূপালি জরির অগুনতি চুমকি

কুচি ফুটে উঠেছে। সাদাসিধে নীলাম্বরী কখন যে হঠাৎ জড়োয়া হয়ে গেল টেরই পাইনি।

একসারি খুঁটি পোতা, কাত হয়ে, দেখছিলাম সকালবেলা নীলাম্বরীর পারে। জেলেরা জাল টেনে তুলছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তারা আর নেই—বালুচর পেরিয়ে, সবুজ মাঠের উপর জেলেনীরা চলেছে মাথায় ঝাঁকা করে বাজারের দিকে।

মাঠের গোরুগুলো ঠিক সেই রকম ছবিতে আঁকা। শুধু compositionটা বদলে গেছে। একদিকে বেশীর ভাগ জড়ো হয়েছে—অন্যদিকে দুটো-চারটে ছিটকে-পড়া।

পেছনের বস্তিতে জেলেনী কলতলায় কাপড় কাচছে। এমনি আঁটসাঁট গঠন যে সমস্ত শরীর দু ভাঁজ করে পায়ের কাছে কাপড় আছড়ানোতেও শরীরের কোনো জায়গা দুলে উঠছে না। আমাদের মালীর বউ নাইতে বসেছে। কাকের কা-কার সঙ্গে কাপড় কাচার ধোপধাপ আর কলতলায় ঝাঁট দেবার শব্দ।

জোয়ার আসার সময় হয়েছে। বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে তার প্রথম মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে দেখি কপাল জুড়ে চওড়া লাল আবীর মেখেছেন, এক কান থেকে আরেক কান অবধি।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ?

আজ সন্ধ্যেয় কি বাসর-সজ্জাটাই না পরেছিলে !

এতবড় কালো ঘোমটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে ?

* * *

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আজ সন্ধ্যেয় গিয়ে বললুম মাটির মানুষ আমি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি যেখানে মাটির শেষ। তোমার নীল কোলে জায়গা দাও।

গরম বালুতে পা পুড়িয়ে রোজ আসি—তুমি আমার পা শীতল করে দাও। একদিনের তরে সমস্ত ভেতরটা ঠাণ্ডা করে দাও না কেন ?

গভীর অন্ধকার—পরশু মহাশিবরাত্রি—শুধু বাক্ আর স্পর্শ। গুরু গুরু গর্জন ঘন ঘন মিশে যাচ্ছে পাগলা হাওয়ার এদিক ওদিক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে।

কখনো কানে আসছে দুয়ে মেলার শব্দ। কখনো হাওয়া যেন গর্জন থেকে খসে পড়ে যায়। তারপর হঠাৎ গমগমানি যেন নিজেকে একা বোধ করে থেমে যায়। নোনা বাতাস কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, কখনো বা জোর লাগিয়ে চাদরখানা সরিয়ে দেয়।

তবু যেন অন্ধকারেরই জয়। দূরের গর্জন, মাঝামাঝি অন্ধকার, কাছের স্পর্শ সব কিছু তলিয়ে পড়ে কি যেন অজানা অন্য কোনো অন্ধকারের তলায়।

এই গভীর বিলুপ্তি অতল বিস্মৃতি নিয়ে আসে না কেন?

সমুদ্রপারে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না—

* * *

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, আমার দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা কালো ভারতবাসীর মত। সুরাৎ মাহমুদ তার তলোয়ার চালাতেই তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না—Scatters and slays with his enchanted sword—আমার হয়েছে সত্যিকার তাই, কাক—দুপুরের শান্তির প্রধান অন্তরায়। সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জন, দমকা হাওয়ার দোল-লাগা নারকেলপাতার শিরশিরি সব চাপা পড়ে যায় ঐ কর্কশ লুব্ধ চীৎকারের তলায়। এ চীৎকারে যেন সমুদ্রপারের পচা মাছের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীল ফরাস পেতে রেখেছ এতক্ষণ ধরে—নাচ শুরু হোক না।

সমুদ্রের বুক চিরে যেন অন্ধকার বেরিয়ে এসে, আলাদীনের জিনের মত সমস্ত আকাশ বালুপার কালো বিষ ঢেলে একাকার করে দিল।

জলের ভেতরে কি আরেকটি জিন এখনো পোরা রয়েছে নাকি? তার লাথালাথির গমগমানিতে সমস্ত আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

পশ্চিম আকাশের লাল কাগজের ফানুস বাতিতে যেন হঠাৎ আগুন ধরল। দেখতে না দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে আলোটাও নিবে গেল। পূবে-পশ্চিমে একটানা অন্ধকার।

* * *

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বউমার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। ডানদিকে বালুচরের লম্বা কোলবালিশ,

বাঁদিকে ঘন ঘোলাটে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে বানিয়ে তোলা তুলতুলে আরেক কোলবালিশ। কে যে পাখার হাওয়া করছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঘের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘোলাটে শাড়ীর জমি হেথা-হোথা সর্বত্র বারে বারে কেঁপে উঠেছে। দুঃস্বপ্ন দেখছেন কিনা বলা যায় না, মাঝে মাঝে গুমরে উঠছেন, পাখার হাওয়ায় সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে—পষ্টাপষ্টি কিছু বলার উপায় নেই।

পাখার হাওয়া ঝড়ের হাওয়া হতে চললো যে। হঠাৎ কখন এক পাশের শাড়ী দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাদা ফ্যানার পেটিকোট—না লেসের সেমিজের শেষর দিকটা?

কালোজাম, গোলমোহর, নিম-নারকোলে কী মাতামাতি। সমস্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরের দিকে তাকাবার উপায় নেই। শুধু ঐ ইলেকটেরির খুঁটিটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ওর কোনো নড়নচড়ন নেই। এত বড় সমুদ্র—তিনিও দুলে দুলে ওঠেন প্রাণের কাঁপনে—কিন্তু খুঁটিটার কাঁপন নেই, জীয়ন মরণও নেই।

পারের সবাইকে তাড়াবার জন্য আজ গুমরে গুমরে বড় বড় ঢেউ পারে এসে আছাড় খাচ্ছিল। কি মৎলব কে জানে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার টেনে আনার জন্য আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। কাল অমাবস্যা—আজ এত তাড়া কিসের?

অন্ধকার যেন পেছন থেকে তাড়া করে করে বাড়ীতে ভাগাল।

বারান্দায় বসে আছি জোর আলো জ্বালিয়ে কিন্তু বাইরের অন্ধকারের গায়ে যেন আঁচড়টি কাটতে পারছে না। ওদিকে সমুদ্র হুংকার দিয়ে বারে বারে শোনাচ্ছেন, আজ হোথায় যাওয়া বারণ। কাল মহাশিবরাত্রির আয়োজনে কোন কাপালিকদের ডমরু আজ সন্ধ্যে থেকেই বাজতে আরম্ভ করল।

নোনাগন্ধে খানিক খানিক আভাস পাচ্ছি।

* * *

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বড়লোক দেউলে হওয়ার অনেক দিন পরও জাঁকজমক সমানই চলতে থাকে—বরঞ্চ অনেক সময় বেড়ে যায়। পালাপরবে গমগমানি বরঞ্চ বেশী হয়—

ওদিকে আটপৌরে খরচে টানাটানি চলে।

আকাশের একটানা লাল নিভে গেল কিন্তু টুকরো টুকরো মেঘে তার জাঁকজমক জেগে রইল অনেকক্ষণ ধরে—আরো বেশী লাল হয়ে। দেউলে-হয়ে-যাওয়া জমিদারের ইয়ারবকসী যেন এরা। মনিবের শেষের তলানিটুকু খেয়ে মাতলামির লালে লাল। হুজুর লুকিয়ে থেকে গাদা গাদা আবির ছুঁড়ছেন।

আটপৌরে আকাশ ম্লান কিন্তু মেঘে মেঘে পালাপরবের বাড়াবাড়ি জাঁকজমক। আড়াল থেকে অস্তগত সূর্য পেলা দিচ্ছেন। দাক্ষিণ্য থেকেই দারিদ্র্য ধরা পড়ে।

পূবে-পশ্চিমে দেখনহাসি, ইলেকটেরিতে খবর পাঠানো না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিম লালের ইশারায় পূব লাল হল। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কি গোপন কায়দায় তার খবর পূবে পৌঁচচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনো রঙ নেই, ফেরফার নেই—কি করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে—এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়!

* * *

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আকাশ যেন উবু হয়ে শুয়ে সমুদ্রকে চুমো খাচ্ছে—এদিকে সমুদ্রের পা ওদিকে মুখ। রঙে রঙে সমস্ত জিনিসটা ঘটল। প্রথম চুম্বনে দিগ্বলয় লাল হল। তারপর নিবিড়তর চুম্বনের কাতরতায় বেগুনি হল, সেই বেগুনি ফিকে হতে লাগল, এদিকে ঢেউয়ের দোলায় সুন্দরীর পা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে—সমস্ত দেহ শান্ত। চুম্বনের তরঙ্গ শান্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ওপার হতে এপারে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে—কেন্দ্রীভূত আনন্দ এপারে এসে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তারপর বেগুনি সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে ছাইরঙ হল। এ যেন সর্বশেষ নিবিড়তম চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু ঠোঁট দিয়ে শুষে নিয়ে চলে গেল। এপার ওপার জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন ফ্যাকাশে শবদেহ।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ল। তারপর আকাশে ছোট ছোট মোমবাতির পিদিম জ্বালিয়ে শবের পাহারা।

সেই কালো চাদরে সব কিছু ঢাকা। দক্ষিণমুখো হয়ে বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁদিক থেকে আসছে কান্নার শব্দ—শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডানদিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি—যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনে মোমের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

কিসের প্রতীক্ষা? কোন চন্দ্রোদয়ের? যেন তিনি সুধাভাণ্ড নিয়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে কোন মৃতদেহে প্রাণ দেবেন।

* * *

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সূর্য অস্ত যাব-যাব করছেন এমন সময় পারে পৌঁছলুম। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ছিল, অন্য দিনেরই মত। ভাবলুম কালকের মত আজও ফাগের খেলা জমে উঠবে। প্রথম লক্ষণ দেখাও দিল। আকাশ ফিরোজা সবুজ শাড়ী পরল—আস্তে আস্তে গয়না চাপাবো চাপাবো করছে, এমন সময় দেখি শাড়ী-খানাই ফিকে হয়ে হয়ে, কেমনধারা সেই ছাইনীল হয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি তারো সেই ফিকে শ্যাওলা সবুজ রঙ। চারদিকই কেমনধারা আধমরা ছাইরঙ ধরতে লাগল।

কালকের দিনের সব সাজসরঞ্জামই ছিল কিন্তু কেন জানিনে খেলা শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দেখি আকাশে দ্বিতীয়বার অতি ক্ষীণ চাঁদের অত্যন্ত ম্লান ঝিলিক।

যেন হিমালয় তার সব রঙ, সব সৌন্দর্য মুছে দিলেন, আড়ম্বর-আভরণ-হীনতার মাঝখানে দুখিনী কন্যাকে ঘরে তুলবেন বলে। চাঁদের মুখে তাই কি ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে লাগল?

অন্ধকার যখন ঘনতর হল তখন চাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সবাই, মেঘ জল বালুচর আপন আপন আলো নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

বরণশেষে বাড়ী ফিরলুম।

ফাল্গুন মাস—কিন্তু কোনো দিকে নবজাগরণের কোনো চিহ্ন নেই। এদেশে শীতের ঘুম নেই, বসন্তের জেগে-ওঠাও নেই।

* * *

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

মাঝআকাশ থেকে একটুখানি ঢলে-পড়া তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী; সূর্য হেলে পড়েছেন কিন্তু তখনো জ্যোতির্ময়। তাই ভস্মভাল শিবের ললাটে হীনজ্যোতি

শশাঙ্ক-কলা। উমা কি এখনো ঘরের কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি – বেলা যে গড়িয়ে এল। জেলেদের পাড়ায় কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে—জেলেনীরা রঙীন-শাড়ী পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে—সমুদ্রপারের লোক বোধ হয় স্বল্পভাষী হয়, ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথাবার্তার মেহন্নতে গল্পগুজব জমে না, ঝগড়াঝাঁটিতে গলা চিরে যায়—জেলেরা বোধ করি বাজার গেছে—নারকোলপাতার ছাউনির কুঁড়েঘর ঐ নারকোলগাছের গা ঘেঁষে যেন রোদ থেকে শরীর বাঁচাচ্ছে।

উমার কাজ শেষ হয়েছে। ভস্ম মুছে ফেলে, ঘোর আসমানি রঙ দিয়ে শঙ্করের কপাল ঢেকে দিয়েছেন—তার উপরে দিয়েছেন তিনটান টকটকে ফাগ—আর মাঝখানে এঁকে দিয়েছেন উজ্জ্বল, নবকান্তি, অকলঙ্ক শশাঙ্ক।

হাসি ফুটেছে। সমুদ্রের জল আসমানি রঙ নিয়েছে—ধূসর বালুচর সোনালি হল। সমুদ্রের লোনা হাওয়ার জোর কমল—উত্তর থেকে হিমালয়ের বাতাস এল নাকি উমার চঞ্চল অঞ্চল আন্দোলনে?

সমুদ্রের একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—তার মাঝে ডুকরে ডুকরে ওঠা গুমরানো।

নিমগাছ ডাল নাড়ছে, কালোজামের পাতা কাঁপছে, বারান্দার টবে বেত-গাছের সরু পাতা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। দিনের বেলা তারা রং বদলায়, পাখী এসে বসে তাদের উপর, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন সূর্যাস্তের কত রকম আলো তাদের উপরে এসে পড়ে—তারা সাড়া দেয়—তাদের জীবনপ্রবাহেও ঢেউ ওঠে, তারাও দোল খায়।

রাতের অন্ধকারে তারা শুধু সমুদ্রের কান্না শোনে—একমনে। বাতাস সে কান্না বয়ে নিয়ে আসে, আর সেই বাতাসের ডাকে সাড়া দিয়ে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে যেন নিজেকে মিশিয়ে দেয়।

সমুদ্রের কান্না থামে না বলে, ওদেরও যেন চোখে ঘুম নেই।

এখানকার সংসারের সব রকমের সব কটা তার যেন সমুদ্রের কান্নার সুরে বাঁধা।

* * *

২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

এ খেলা তিনদিন ধরে চলছে। আকাশ, সমুদ্র, বালুচর বিবর্ণ নিরস দেখায় যতক্ষণ সূর্য একেবারে না মিলিয়ে যান—মনে হয় আর সবাই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে

আছে। সূর্য যেই অদৃশ্য হলেন অমনি কী গোপন লিপ্সায় আকাশের গাল লাল হয়ে আসে—ভাসুরঠাকুর উঠে যাওয়া মাত্রই কনেবউ যে রকম বরের দিকে তাকায়—প্রথমটায় আমেজ লাগার মত। তারি রেশ সমুদ্রের ফেনায় লেগে গোলাপী হয়ে ওঠে—তারি পরশ ভেজা বালুতে গোলাপ জামের ফিকে গোলাপী হয়ে দেখা দেয়। তারপর বরবধূতে কি কথাবার্তা হয় জানিনে—কনে লজ্জায় টকটক করতে থাকেন—ফাগ সিঁদুর সব রঙ তখন হার মানে। আর সে লালের সঙ্গে সঙ্গে পেছনের আকাশ হয় ঘন আসমানি, দূর সমুদ্রের জল হয় গাঢ় পান্না। সমস্ত দিনের মূর্ছা কেটে গিয়ে বিরাট আকাশ যেন গমগম করে ওঠে, পশ্চিম থেকে পূব জুড়ে লম্বা লম্বা রঙিন কড়িকাঠ যেন পূর্বাচল অস্তাচলকে জুড়ে দেয়, দূরে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের কোণে।

তারপর লজ্জা-সরম ইশারা ঠারাঠারিতে কি খুশি হয় জানিনে। দেখতে পাই পিদিম যেন কেউ নিভিয়ে দিল—না বৌ কালো কপাটের দরজা বন্ধ করে দিল—না কালো ঘোমটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙল। এ কী কাণ্ড। চাঁদের আলো জ্বালিয়ে আকাশে তারার ঘুঁটি সাজিয়ে বরবধূতে এ কি খেলা!

* * *

৫ই মার্চ, ১৯৪৭

এখানে সমুদ্র নেই। উঁচুনিচু সবুজ ক্ষেত—মাঝে মাঝে তালগাছ আলের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে। তারপর নিকটের পাহাড়—বড় বড় পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। তার পেছনে দূরে নীলাভ পাহাড়—লাইন বেঁধে পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে।

বর্ষাকালে এই শুষ্ক দেশও সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের মাঝামাঝি এরি মধ্যে ফালি-ফালি হলদে ক্ষেত বেরিয়ে সেই সবুজের গা যেন জখম করে দিয়েছে। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আকাশ কি যেন এক ব্যাকুল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে—পালাবার পর্যন্ত সাহস নেই। পূবের বাতাস আসছে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। মৃদু তপ্ত এবং অল্প ভেজা-ভেজা। দুদিন বাদেই পশ্চিম থেকে হু-হু করে জোর গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করবে—পূবের বাতাস এখনো ঠিক মনস্থির করতে পারছে না এদেশে আর আসবে কিনা।

পশ্চিমের হাওয়া পৌঁছায় নি বটে কিন্তু গাছপালা তার খবর পেয়েছে কোন্ আশ্চর্য উপায়ে—সব ফুল গা থেকে আছড়ে ঝেড়ে ফেলেছে। রক্তকরবী ঝরেনি কিন্তু কে যেন আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়ে গেছে। শুধু বুগনভিলিয়া আর রাঙাজবা —না স্থলপদ্ম ?

এতদিন ঘুঘু ডাকেনি। তপ্ত মধ্যাহ্নে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত তার ডাক। সমস্ত শীতকাল ময়ূর নিস্তব্ধ ছিল—মেঘ আসার কোনো লক্ষণ নেই তবু থেকে থেকে ডেকে ওঠে—ঠিক যেন একা কৈ ? একা কৈ প্রশ্ন শুধায়।

প্রজাপতি পালিয়েছে দল বেঁধে—না তাদেরো ডানা ঝলসে গিয়েছে ?

দুপুরবেলা শুনি সাপে যেন কার গলা চেপে ধরেছে—চাপা গলার ক্ষীণ আর্তরব —একি খাণ্ডবদহনের অগ্নিদেব পশুভোজনের বিরাট পর্ব আরম্ভ করেছেন ?

না দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ? সবুজ অঞ্চল গেছে—এখন যেন অঙ্গবস্ত্র প্যাঁচের পর প্যাঁচ খুলছে গ্রীষ্ম দুঃশাসন—বীভৎস আনন্দ যেন ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে চেখে নিচ্ছে।

ধরণীর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায় পত্রে-পুষ্পে ; কূপগহ্বর অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের মত—ক্ষতজল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে।

* * *

৬ই মার্চ, ১৯৪৭

বহুকাল পূর্বে পড়েছিলুম কারো ফাঁসীর হুকুম হলে রুশিয়ার কোন জেলে জেলরের সুন্দরী মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে প্রেম করতে যেত। তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তি করে সেপাইদের হুকুম দিতে শেকলে তাকে আচ্ছা করে বাঁধবার। তার পর সেই মেয়ে সিগরেট ফুঁকে ফুঁকে আসত তার কাছে। হাত দিয়ে জ্বলন্ত সিগরেট তার চোখের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ধরত। কয়েদী মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে সরিয়ে দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যেত। তারপর মেয়েটা সিগারেট চোখের উপর চেপে ধরে তাকে অন্ধ করত।

দ্বিপ্রহরের সূর্য ক্রমেই কুয়োর জলের দিকে এগিয়ে আসছে—জল ক্রমেই নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে। তারপর শেষের দিন আসবে যেদিন তার স্বচ্ছ টলটলে চোখ কানা হয়ে গিয়ে থলথলে ঘোলাটে কাদা বেরুবে। তারপর তাও শুকিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

থাকবে অন্ধকার কোটর।

* * *

৮ই মার্চ, ১৯৪৭

সকালবেলা এবারে এখানে পৌঁছে দেখি চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পূব-পশ্চিম কোনো দিক থেকে হাওয়া বইছে না। সমুদ্র জমে-যাওয়া নীল বরফের মত—স্কেটিং রিঙ্ক। তারি মাঝখানে দক্ষিণ বাতাস এল জোর। নারকোল, গোল-মোহর, নিম, বকুল দুলে উঠল—সমুদ্রের সর্বাঙ্গ যেন হাল চালিয়ে চষে দিল।

এ দক্ষিণ বাতাস ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়। এ এসেছে সবাইকে চঞ্চল করে দেবার জন্য। কলতলায় সুন্দরী কাপড় সামলে স্নান করতে পারছে না, নারকোল ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে, কলতলার শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই বিড়ি ধরাতে পারছেন না—এক চোখ সুন্দরীর দিকে, পাশের বাড়ী বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ী হেলতে হেলতে ধুলোয় জবুথবু হয়ে পড়ে গেল।

* * *

৯ই মার্চ, ১৯৪৭

সমুদ্রের গর্জনে নানা সুর। কোনোদিন অশান্ত উদ্বেলিত হাহাকার, কোনো দিন গুমরে-ওঠা চীৎকার, কোনো দিন একটানা করুণ আর্তনাদ। যেদিন জোর পূরবীয়া হাওয়া বয় সেদিন সব গর্জন ক্রন্দন ছিন্নভিন্ন হয়ে পারের দিকে আসে—আজ হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস বন্ধ হল সন্ধ্যাবেলায়, কিন্তু পুবের বাতাস এল না। আজ তাই সমুদ্রের একটানা কান্না লহমার তরে বিরাম নিচ্ছে না। ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ চুপচুপ দাঁড়িয়ে, আজ পর্যন্ত তাকে কখনো কোনো শিহরণে বিক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।

কে শুনছে? পারে লোকজন নেই। গয়লাপাড়ার শেষ বাতি নিবে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে কোনো কোনো বাড়ীতে আলো নেই। চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে খোলা জানালা চৌকো চোখের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে—কেমন যেন অন্ধের তাকানোর মত। মাঠে, রাস্তায়, বালুপাড়ে চাঁদের আলোর অতি ক্ষীণ স্তিমিত আস্তরণ। শুধু সমুদ্রের জলে যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে সেখানে গালানো রূপা বালুচর থেকে সোজা পুব আকাশে গিয়ে মিলেছে।

জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন যেন মনে হয় গাছগুলো সমুদ্রের মতই প্রাচীন। তারা বহুকাল ধরে এই নানা সুরের কান্না শুনেছে। তারা যেন তার কারণও জানে। একে অন্যের দিকে মাথা দুলিয়ে কি যেন বলে, আর সবাই শিরশিরিয়ে উত্তর দেয়, "ছিছি, ছিছি।"

* * *

১১ই মার্চ, ১৯৪৭

টলটল নীল রঙ সমুদ্রের আর দূরের আকাশ ঘন বেগুনি। পশ্চিমের আকাশ লাল টুকটুকে—মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক থাবড়া মেঘ শুভ্রমল্লিকার স্তূপের মত জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণমুখো হয়ে আডায়ারের দিকে চললুম। যেতে যেতে যেখানে আডায়ার নদীর মোহনা সেখানে পৌঁছলুম। তিনদিকের ঢেউ সেখানে এলোপাতাড়ি মারামারি করে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর বালু জমে জমে সমুদ্র ঐ জায়গাটায় অগভীর। গোটা পাঁচেক জেলে গোড়ালি জলে সুতো দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টায় ডাইনে বাঁয়ে চলাফেরা করছে। সাদা পাল তুলে সায়েব মেম আডিয়ার উজিয়ে চেট্টিনারের বাড়ীর দিকে হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে।

মোহনার জল নীল হতে আরো নীল হতে লাগল। দূরের আকাশ বেগুনি ছেড়ে গাঢ় নীল হতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে দুই নীলে মিলে গিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—দূরের আকাশ আধা আলো-অন্ধকারে আর প্রায় দেখা যায় না। সে-নীল এমনি জোয়ারের মত সব কিছু ছাপিয়ে কাছে আসতে লাগল, যেন মনে হল বাতাস পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। জেলেদের ময়লা কাপড় সে-নীলে ছুপিয়ে রঙ ধরল—আমার মনে হল যেন নীল রঙ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছি।

নীলের বানে সব কিছু ডুবে গেল। আমি চোখ বন্ধ করলুম। সেখানেও নীল—চোখের সাদা-কালো কী দুই-ই নীল হয়ে গেল?

* * *

১২ই মার্চ, ১৯৪৭

বালুপাড়ে কত অজানা পদচিহ্ন; তার উপর সাগরের ঢেউয়ের কী রাগ। দূর থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে, আকুলিবিকুলি হাত বাড়িয়ে মুছে দেবার কী অবিরাম চেষ্টা। উঁচু পাড়িতে বসে দেখি জোয়ারের জলে মুছেই যাচ্ছে, মুছেই যাচ্ছে। এদিকে লোকজনের চলাচল কমে গেল—নূতন পদচিহ্ন আর পড়ে না বললেই চলে। তারপর যতদূর দেখা যায় সাগরের জল ধুয়ে-মুছে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এবারে ভাটার জল আর এগুচ্ছে না। ঢেউ ভেঙে পড়ে লম্বা লম্বা হাত আর এগিয়ে দিচ্ছে না—এখন যেন লক্ষ লক্ষ রূপার নূপুর নেচে নেচে নাচের গরমে গলে গিয়ে জলে মিশে যাচ্ছে।

সকালবেলা গিয়ে দেখি সেই পরিষ্কার ধোয়া-মোছা বালিতে সাগর ঝিনুকের গয়না সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে—প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বাড়ীতে কুড়িয়ে আনলুম। দেখি ম্লান হয়ে গিয়েছে। যেন সুন্দরীর কানের দুল ভেলভেট বাক্সের কফিনে সাজানো ফ্যাকাশে মড়া।

* * *

১লা আগস্ট, ১৯৪৭

এবারে প্রথম সন্ধ্যায় সমুদ্রপারে গিয়ে দেখি সবাই যেন বেজার মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছেন। আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে—বাড়ীর বউরা যেমন মুখ গুমসো করে শাশুড়ীর দিকে না তাকিয়ে আপন আপন কর্তব্য করে যান। আমি এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে অনেকক্ষণ চলাফেরা করলুম কিন্তু কেউ একটিবারের তরেও সাড়া দিল না।

সবাই আপন আপন কাজ করলেন আবার—মিনিমাল রেট। আকাশ যে সেই শেলেটের রঙ নিয়ে মুখভার করে বসেছিল তার রদবদল হল না—জল যে সেই ফিকে শ্যাওলার রঙ নিয়েছিল তার উপরে সূর্যাস্তের কোনো রঙ এক লহমার তরে গায়ে মাখল না—আকাশ কতকগুলো সাদা মেঘের বুদ্বুদ ওড়াচ্ছিল, সেগুলোকে নড়ালো না, ফাটালো না—জলের ঢেউ একটানা দড়ি পাকিয়ে পারে এসে সেগুলোকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ল, পারের দিকে এগুলো না, সমুদ্রের দিকে পেছুলো না।

আমি অবহেলায় লজ্জা পেয়ে বাড়ীমুখো হলুম।

এমন কি সেই চারজন জুয়াড়ি ঠিক সেই রকম উবু হয়ে আধা আলো-অন্ধকারে জুয়া খেলছে। এই চারটি মাস যেন হুশ করে তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।

* * *

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭

ফোটোগ্রাফ তোলাবার সময় মানুষ যে রকম কাঠের পুতুল হয়ে বসে, আজ সকাল থেকে জল স্থল আকাশের সেই অবস্থা। যে মেঘের টুকরো ভোর হওয়ার সঙ্গে আডায়ারের আকাশে বাসা বেঁধেছিল সে এখনো ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—টেলিগ্রাফের খুঁটিতে শূলবিদ্ধ হয়ে। কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার স্পন্দন সমস্ত নিস্তব্ধতাকে যেন আরো নিস্তব্ধ রূপ দিচ্ছে, সিগরেটের ডগা থেকে ছাইটুকু মাটিতে পড়ল ডাইনে বাঁয়ে এতটুকু না পড়ে।

কী অসহ্য থমথমে গরম। যেন ইলেকট্রিক উনুনে রান্না হচ্ছে—আগুনের হল্কা চোখে পড়ে না। কালোজাম পচতে আরম্ভ করেছে, নিমপাতা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, কলতলার কলরব চীৎকার-বিদীর্ণ। দূর জেলেপাড়া থেকে মেয়েটি কলসী কাঁখে করে, আসছে যেন রোদ্দুরের বন্যা উজান ঠেলে ঠেলে। এদিকে অজন্তা-স্তনওয়ালী মালীবউ সবুজ মেরুনের শাড়ী কাচছে, আর থেকে থেকে কপালের ঘাম মুচছে।

এতদিন হাওয়ার গর্জন আর সমুদ্রের হুঙ্কারে বাড়ীঘরদোর ডুবে থাকত বলে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল কানে এসে পৌছত না। আজ বাতাস নেই, সমুদ্র ক্লান্ত—তাই অনেক রকম শব্দ কানে এসে পৌচচ্ছে, এমন কি পাশের বাড়ীর কড়া পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রার অর্ধগুঞ্জরণ এখানে এসে পৌচচ্ছে। রোজার শেষের দিক, কড়া গরম, হাওয়া বন্ধ—তাই সে গুঞ্জরণে ক্লান্তি জড়ানো।

পশ্চিমের বর্ষা এদেশে দুর্বল—পুবের বর্ষার এখনো ঢের দেরি। ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, দেশী লোক এখনো আসনে বসেননি—তারি ফাঁকে লাহোর কলকাতার অরাজকতার মত গরমের একচোট নির্মম প্রহার!

* * *

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭

যখন বন্ধু কলকাতায় তখন তিনি কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত থাকেন বলে চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, যখন বোম্বায়ে তখন dull feel করেন বলে—তা সে বর্ষার জন্যই হোক অথবা কোনো কাজকর্ম নেই বলেই হোক—চিঠি লিখতে পারেন না; তার উপরে, তাঁরই ভাষায় মাঝে মাঝে চিঠি না লেখার spell আসে বলে চিঠি লিখতে পারেন না। এ তিন ফাঁড়া কাটিয়ে চিঠি লেখার শুভলগ্নে পৌছতে পৌছতে আমাদের বন্ধুত্ব এত পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে তখন চিঠি লেখার আর প্রয়োজন থাকবে না। 'অনুপস্থিতি' নাকি 'দুই বিরহী হৃদয়কে এক করে দেয়'—চিঠিপত্র না লেখার নীরবতা দুই হৃদয়কে আরো এক করে দেয়। তার উপর আরো একটা প্রবাদ রয়েছে—'নীরবতা হিরণ্ময়'।

আমার হাসি পেল, অগোচরে যে অবহেলা রয়েছে সে-ই এসব ফাড়া জুটিয়ে দিয়ে অপরাধী বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায় এবং অজানাতে সেই প্রলেপ 'যুক্তি'র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ ভাবে সে দুর্গন্ধপ্রলেপ বন্ধুর কানে সুধাবর্ষণ করবে।

* * *

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭

কয়েকদিন ধরে বেশীর ভাগ সময় হাওয়া বন্ধ থাকে বলে গরমে মনপ্রাণ কচ্ছপের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। কাল বেতারে বলল আজ এ অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। সকালে দেখি হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্ষার গোড়ার দিকে যে রকম পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বইত ঠিক সেই রকম গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে কিন্তু উপরের আকাশে অম্বুহীন পাণ্ডুমেঘ পূবসাগর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে চলেছে। দুপুরবেলা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—বিকেলের দিকে ফের পূবের বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ভাবছি এই দুটানার ভেতর আকাশ মনস্থির করে বর্ষণ করবেন কি করে। এযাবৎ যা অবস্থা তাতে তো মনে হয় না বৃষ্টি হবে। অথচ বর্ষায় সমুদ্রের প্রলয় নাচ দেখার জন্যই তো এখানে এলুম। গরমে প্রাণ যায়, নতুন বই আরম্ভ করতে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিনে।

জানি অভ্যাস নেই বলে লিখতে কষ্ট বোধ হয়। মানুষ সে কষ্ট নানা কারণে সয়ে নিয়ে বই লেখে। কেউ টাকার জন্য, কেউ প্রিয়জনদের কাছে নিজের দাম বাড়াবার জন্য, কেউ আত্মম্ভরিতার তাড়নায়। আমার বেলা শুধু প্রথম কারণটা খাটে, অথচ টাকার জন্য লিখতে মন যায় না। মনে হয় তার চেয়ে অল্প মেহনতে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাওয়া যাবে।

* * *

১৯শে আগস্ট, ১৯৪৭

মাদ্রাজ উপকূল দুই বর্ষার সঙ্গমভূমি। পশ্চিমের বর্ষা এখানে আসে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে তার আর সে ঝামর মুখ কৃষ্ণগম্ভীর হয়ে বর্ষণ-আশা সঞ্জীবিত করে না। ব্যাঙালোরেই দেখছি পশ্চিমের মেঘ পূব দিকে যাচ্ছে কি রকম পানসে চেহারা নিয়ে। এখানে দেখি সে মেঘ প্রায় সাদা হয়ে গিয়ে শরতের হংসশুভ্র ঝালর হয়ে নীল চন্দ্রাতপে দুলছে। এখান থেকে আর পূব দিকে যেতে চায় না, এক সমুদ্র পার থেকে রওয়ানা দিয়ে অন্য সমুদ্রপারে পৌঁছে আর যেন এগুবার উৎসাহ তার নেই।

তাই কোনো কোনো দিন দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। নীচে পশ্চিম সাগরের মেঘ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর উপরে পূব সাগরের মেঘ মন্থর গতিতে পশ্চিম দিকে

রওয়ানা হয়েছে। আর কখনো বা দেখি পশ্চিমের মেঘ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে আর উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে পূবের মেঘ শান্ত শুভ্র স্থির হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে—দুই স্তরের মাঝখানে বিপুল ব্যবধান।

কখনো আসে পশ্চিম থেকে গরম বাতাস—দাক্ষিণাত্যের তৃষ্ণার্ত উষ্ণ জনপদের বহ্নিদাহণের শুষ্ক ও চর্মদাহক। কখনো আসে বাতাস—ভিজে ভিজে। বঙ্গসাগরের ঠাণ্ডা জলের পরশ পেয়ে পেয়ে সুশীতল।

কাল রাত্রে দুই বাতাসে আর দুই সমুদ্রের মেঘে কি বোঝাপড়া হল জানিনে। মাঝরাতে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাতাস আর বৃষ্টি এল পশ্চিম দিক থেকে।

সকালবেলা দেখি সমস্ত আকাশ কালো কম্বল দিয়ে পালঙ্ক ঢাকা দিয়েছে—দুই মেঘের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তারা যে গভীর নিবিড় আলিঙ্গনে গড়িয়ে পড়েছে, বাকি পৃথিবীকে তারা দেখতে দিতে চায় না।

* * *

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৭

অশান্ত ক্রন্দন।

সমুদ্রপারে অশান্ত মন নিয়ে যেতে নেই। মন জানে যে সমুদ্র প্রাণহীন তার গর্জনে অথবা ক্রন্দনে কোনো অর্থ নেই এমন কি গর্জন বা ক্রন্দন শব্দ দিয়ে এই অনুভূতিহীন ধ্বনিকে চৈতন্যের স্তরে নিয়ে আসা ভুল। সুস্থ লোক এতত্ত্ব জানে, এবং তার অবচেতন মনেও এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই বলে সমুদ্রের ধ্বনি সম্বন্ধে সে খানিকক্ষণ পরেই অচেতন হয়ে যায়।

কিন্তু যার অবচেতন মন বিক্ষুব্ধ সে বেশীক্ষণ বুদ্ধিমানের মতন স্বীকার করে বসে থাকতে পারে না যে সমুদ্রধ্বনি নৈসর্গিক প্রাণহীন শব্দ তরঙ্গ মাত্র।

সে শুধায়:

এর হৃদয়ের অন্তস্তলে কি আলোড়ন? সে আলোড়নের কেন্দ্র কোথায়? সে কি দূরে উদয়-দিগন্তেরও পেছনে? সেই আলোড়ন কি দৃষ্টির অগোচরে অন্তরালে উদ্বেলিত হয়ে হয়ে এই সিন্ধুপারে এসে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে শুভ্র অশ্রুজলের কোটি কোটি শ্বেত বুদ্বুদে ভেঙ্গে পড়ছে?

না এ অনাদৃতা সুন্দরী? ক্ষণে ক্ষণে নীল অঙ্গনের উপর শুভ্র ফেনের আলিম্পন এঁকে রবিকরকে তার চটুল নৃত্যে প্রলুব্ধ করছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গের ভয়ে দ্রুততর গতিতে নব নব আলিম্পনের পরিবেশন করে যাচ্ছে। সব চেষ্টা বিফল হল বলে শেষ রশ্মি মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সকরুণ ক্রন্দন নিষ্ফল

আক্রোশ গর্জনে পরিণত হচ্ছে ?

না এ অভিমানী শিশু। দূর থেকে দেখতে পাই ছুটে আসছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, ডাইনে বাঁয়ে কোণের কাছে বিকৃত ভঙ্গি নিয়ে ফাট-ফাট হচ্ছে, তারপর কাছে এসে পারের উপর আছড়ে পড়ে শতধা অশ্রুতে বিগলিত হয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে। পারের মা কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোল দিলেন না। ওদিকে কে যেন সেই থমকে-গিয়ে-চুপ করে যাওয়া শিশুকে মায়ের পায়ের কাছ থেকে ভাঁটার টানে সরিয়ে নিল।

না কাণ্ড জ্ঞান বিবর্জিত মাতাল ? বেহুঁশ বেখেয়ালে ক্রেমন্থ খাঁতের উপর বোতলের পর বোতল সোডার ফেনা ঢেলেই যাচ্ছে, ঢেলেই যাচ্ছে। আর সেই মাতলামোর ভেতরে ও যতই দেখছে হুইস্কি-সোডার রঙ আসছে না ততই রোষে ক্রোধে গর্জন করে যাচ্ছে ?

* * *

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৭

চোখ বন্ধ করে বসেছিলুম। অন্ধকার নেবে আসছিল মুমূর্ষুর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসার মত করে।

ভেতরে ভেতরে যেন সাড়া পেলুম—না সত্যি শুনতে পেলুম আমার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল।

চোখ মেলে দেখি সত্যি তো। আমার চোখের সামনে দিয়ে কে যেন সমুদ্রের উপর সোনালী জল শাড়ী থেকে নিংড়ে ফেলে ফেলে, সমুদ্রকে যেন দুই ভাগ করে সোজা উদয় সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে—চোখ বন্ধ ছিল তাকে দেখতে পাইনি। শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঐ সাদা দেয়াল বেয়ে অভিসারিকা যেন কার বাড়ীর ঝরোকায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল সমুদ্রের উপর তার চলে যাওয়ার সোনালী চিহ্ন ঝলমল করছে—অবাক হয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ঘোমটা নেই।

পূর্ণচন্দ্র।

এক মিনিটের তরে। যার জন্য অভিসার সে যেন তাড়াতাড়ি এসে কালো মেঘের কম্বল দিয়ে সুন্দরীর মুখ ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালী রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হল। আকাশ-বলুপার সব আড়ি-পাতার-দল অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

* * *

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে যায় তাই খবরের কাগজ দিয়ে জানালে সন্ধ্যে সাতটা পনেরোয় দেখা হবে। আমাকে খুঁজে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না জানতুম তাই ডাঙ্গায়-তোলা নৌকাখানার আড়ালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসলুম।

রাক্ষুসে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ সাদা দাঁত দিয়ে বালুপারের গায়ে অবিরাম কামড়াচ্ছে। সূর্য ডুবল সাড়ে ছ'টায় আকাশের শেষ লালিমা মোছার সঙ্গে সঙ্গে বেলাভূমি নির্জন হতে লাগল, সাতটা বাজতে না বাজতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, জনমানবের চিহ্ন নেই, আমি এক নৌকার আড়ালে বসে—মনে কোন ভয় নেই, আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে, কতবার পেয়েছ, কোনদিন ফাঁকি যায়নি।

নির্জন, অন্ধকার। তোমার আসার সময় হল বলে। চিরকাল এসেছ নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাই শুধু চোখ দিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছি।

অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা জলজ্বল করছে।

তোমার আসার সময় পেরিয়ে গেল।

তারপর সাড়ে সাতটা বাজল, পৌনে আটটা, আটটা। একি! তুমি তো কোনদিন এক মিনিটের তরেও আসতে দেরী করো না। আমাকে কোনদিন খণ্ডিত বিপ্রলব্ধ করোনি। তবে আজ! খবরের কাগজে দিয়ে লগ্ন মুহূর্ত পাকাপাকি জানিয়ে দিয়ে।

এক ঘণ্টা ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখছি, বুকের কাঁটা গভীর হতে গভীরতর হয়ে ঢুকেছে।

সোয়া আটটায় উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর দিকে চলার মুখে একবার ফের শেষবারের মত পেছনের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণ-সপত্নের আলিঙ্গনে এতক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিলে? তারি জটার ভেতর দিয়ে আমার অবমানিত প্রত্যাগমনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা দিলে!

লজ্জা পেয়ো না সুন্দরী। বহু লাঞ্ছিত অপমানিত রক্তসিক্ত এ দেহে আর স্থান নেই যেখানে তোমার দৃষ্টিক্ষেপ নব অবমাননার অচেনা বেদনা হানতে পারে।

তুমি যেন বেত্রাহত গায়ে উল্কি সাজালে!

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রায় চতুর্দিকেই খোলা বলে গোলচক্রবাল, গম্বুজের

মত আকাশ। মনে হয় সোনালী নীল আণ্ডার মাঝখানে বসে আছি হাঁসের বাচ্চাটির মত—ছেলেবেলায় বারুণীতে জাপানি খেলা কিনতুম, গোল কাঁচের ভেতর সোনালী হাঁসের ছানা।

এতদিন ধরে এই হাঁসের বাচ্চার মত অপেক্ষা করেছি এই নীল আণ্ডা ফাটবে কবে আর আমি এই বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু যতই ভাবি ততই কূল কিনারা পাইনে যে এই আণ্ডার বাইরে আছে কি। হাঁসের বাচ্চা ডিমের ভেতরে বসে কি ভাবে জানিনে কিন্তু সে যতই কল্পনার ছুট লাগাক না কেন, সে কি কখনো বাইরের পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে। তাই কল্পনা করে কি লাভ।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গল—দেখি চাঁদ যেন আকাশের আণ্ডাতে ফুটো। অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম যে এর ভেতর দিয়ে মুক্তির পৃথিবীর সন্ধান মেলে কিনা।

* * *

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পশ্চিমের তপ্ত বাতাস থেকে থেকে কালোজাম গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া আর নিমের চিকন পাতার ঝুঁটি হাতের মুঠির ধরা এড়িয়ে যায় বলে তারা শুধু দোল খায়।

কৃষ্ণচূড়ার বীজপুট চারমাস হল শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু কিছুতেই গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে চায় না, এরা না খসলে গাছ ফুল ফোটাবে কি করে?

এ যেন মরাস্বামী বিধবার সর্বচৈতন্য অভিভূত করে ভূতের মত চেপে বসে আছে, নূতন প্রেমের নব কিশলয় ফোটাতে দিচ্ছে না।

দূরে এক ফালি নীল সমুদ্র—বালুচর আর দিগ্বলয়ের মাঝখানে সেঁটে দেওয়া নীল রিবন। এর দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণতা এখান থেকে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মৃত্যুর মত এর রং নীল। মৃত্যু অহরহ মানুষের চতুর্দিকে রয়েছে তবু মানুষ তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়—এ সমুদ্রেরও যে শেষ নেই সে কথা মন জানলেও সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

গাছ, সবুজ মাঠ, বালুপার, নীলজল সবকিছু রৌদ্রস্নানে পা এলিয়ে দিয়েছে—কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে শুয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ শরতের নীলরঙ এখনো ধরেনি—বর্ষার ভয়ে এখনো সেই পুরানো ফ্যাকাশে বরষাতি দিয়ে গা জড়িয়ে রেখেছে। বাতাস নিষ্কর্মা ভবঘুরের মত এ-গাছে ও-গাছে ধাক্কা

দিচ্ছে—মেঘ বয়ে নিয়ে আসার বেগার থেকে যেন রেহাই পেয়েছে।

জেলে পাড়ার নারকোল পাতার ছাউনি বর্ষায় ভিজে কাকের মত জবুথবু হয়ে বসে ছিল। রৌদ্রে এখন যেন পালক শুকিয়ে উস্কো-খুস্কো হয়েছে। যদি একদিন উড়ে চলে যায় তবে নগ্ন দারিদ্র্যের এই চক্ষুশূল থেকে হেথাকার মানুষ নিষ্কৃতি পাবে।

গতিহীন, বেগহীন নির্জীবতা পূব বাঙলার নদীর পারে গড়ে ওঠা মানুষকে বাড়ীর কথা দেশের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৯শে জুন ১৯৫৫

স্বপ্ন

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখে।

কি স্বপ্ন ?

আমি যেন একটি রসিকতা তৈরী করার চেষ্টা করছি। ইংরিজিতে যাকে বলে humourous story—ঐ যে-সব বস্তু Tit-Bitsএ বেরোয়।

কি গল্প তৈরী করলুম ?

এক ভদ্রমহিলা ভিখিরি tramp কে শুধাচ্ছেন, 'তা, তুমি কাজকর্ম করো না কেন ?'

'ম্যাডাম, কাজ দেয় কে ?'

'আমি দিচ্ছি। আমার বাগানটি বড় অযত্নে আছে। তুমি ওটাকে একটু সাফ-সুৎরো করে দাও।'

ট্র্যাম একটু ভেবে বললে, 'তাই সই।'

মহিলা বললেন, 'যন্ত্রপাতির কি কি দরকার হবে তার একটা ফর্দ করা যাক্।' বলে তিনি একটা কাগজে 'কোদাল,' 'কাস্তে' এসব লিখলেন। তারপর ভ্যাগাবণ্ডকে বললেন, 'আমার আর তো কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি কাগজ পেন্‌সিল্ নিয়ে ভেবেচিন্তে বাকিগুলো লেখো। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য গোটা দুই স্যানউইচ নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দেখেন, ভ্যাগাবণ্ড লিখেছে, বেশ বড় বড় হরফে,—

এক খানা খাট

দুটি বালিশ !'

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। স্বপ্নে এ রকম গল্প বানাবার প্রবৃত্তি আমার হতে যাবে কেন? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউই তো কখনো বলেননি যে তাঁরা স্বপ্নে রস-গল্প তৈরী করেছেন। কোন humourist-এর আত্মজীবনীতেও এরকম ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি।

হ্যাঁ, জানি, কেউ কেউ একটা episode দেখেছেন। যেমন মনে করো, রবিবাবুর 'গানভঙ্গ'। তিনি দেখলেন, বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ) তাঁর বাল্যসখা এক বুড়োকে মজলিসে গান গাইতে হুকুম দিলেন। সে গান গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললে ব'লে, তিনি তার হাত ধরে তাকে সভাস্থলের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

তাই নিয়ে রবিবাবু 'গানভঙ্গ' লিখলেন।

এরকম ধারা আরো বিস্তর হয়েছে।

কিন্তু এই humourous story by itslf, স্বপ্নেই সম্পূর্ণ তৈরী করে দেওয়া—উপরের episode গুলো, কিছুটা স্বপ্নে বাকিটা জাগরণে—এর উদাহরণ তো জানিনে। এটা কি করে হ'ল।

তখন মনে পড়ল, আইয়ুব, কচিতে, আমাতে একদিন কথা হচ্ছিল, আমরা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাট্য সবই লিখতে পারি। ওৎরাবে কি না, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমরাই হয়তো তখন বলব, এ গল্প কিন্তু গল্প হ'ল না, এ উপন্যাস কিন্তু উপন্যাস হ'ল না, ইত্যাদি। কিন্তু tit-bits-এর গল্প লেখা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ সব গল্পের উৎস কোথায়, কি করে আরম্ভ হয়, তার কোন পাত্তাই আমরা জানিনে। তাই যদি জোর করে কিছু লিখি তবে সেটা হবে nothing: আমাদের ছোট গল্প লোকে বলবে খারাপ ছোট গল্প, উপন্যাস পড়ে বলবে, খারাপ উপন্যাস, ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের জোর-করে লেখা tit-bits প্রচেষ্টাকে লোকে চিনতেই পারবে না, বলবে এটা just nothing।

এ-আলোচনা আমাদের ভিতর কবে হয়েছিল আমার আর মনে নেই। দশ, পনেরো, পঁচিশও হতে পারে, কিন্তু এ আলোচনার কথা আমি বহুবার ভেবেছি।

তাই কি আমার 'অবচেতন' মন যে-সমস্যা তার গোপন কোণে সঞ্চয়ন করে রেখেছিল তাই দিয়ে এই গল্প গড়লে?

কলকাতার ৺কালীপূজো

সকাল ৮'০০ বিকটতম পিচ্-এ তীব্রতম ভলুমে মাইকবাদ্যসঙ্গীত।

চাপা দেবার জন্য রেড়িয়োর একটি যা তা স্টেশনে Classical music লাগালুম। ১০%-ও চাপা পড়লো না। কাজে মন দেবার চেষ্টা করলুম। ইয়াল্লা! হঠাৎ সেই Classical বন্ধ হয়ে তারাও পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে ঐ ফিল্মি গানা দিয়ে।

মোটর স্টার্ট নিচ্ছে না। রোজ সকালে সেটাকে অভিসম্পাত দি। আজ সেটা নন্দনকাননের মধুরতম সঙ্গীত বলে মনে হল—মাইকটা বেশ চাপা পড়েছে। কপাল আমার! অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি স্টার্ট নিল।

প্যাণ্ডাল যদি লং প্লেইং বাজাতো তবে হয়তো বেঁচে যেতুম। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের নীরবতাটাই যন্ত্রণার বহর বুঝিয়ে দেয়। কনফুৎস বলেছেন, নিরেট দেওয়ালটা কোন্ কাজে লাগছে! লাগছে তো তার মাঝখানের ফাঁকটা—দরজাটা। এখানে ঠিক উল্টো। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের ফাঁকটা না থাকলে ঐ চীৎকারে অভ্যস্ত হয়ে যেতুম।

ভাগ্যিস ওরা Classical বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছে না।

বিনোদ বলতো, জোর করে কুইনিন খাইয়েছে কিন্তু রসগোল্লা হলে আরো কষ্ট হত। এটা ঠিক নয়। Rape case আসামীর উকিল মেয়েটার Connivance ছিল প্রমাণ করতে গিয়ে শুধলো, 'কিন্তু তোমার ভালো তো লেগেছিল?' মেয়েটা বললে, 'উকিলবাবু, জোর করে কেউ মুখে রসগোল্লা পুরে দিলে সেটা কি তেতো হয়ে যায়?'

১০'১৫ গর্ব্বযন্তনা থেকে মুক্তি?

১০'২৫ Alas, false pain। ফের শুরু!

১১'৩২ বেশী না, পাঁচ পাঁচ মিনিটের ভিতর পাঁচবার, পিন গ্রুভে আটকে গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁ। cf 'বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে'।

দুপুর ১২·০০ আমার সুখ-শান্তিরও বারোটা। চিৎকার করে গলা ফেটে গেল। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে বুড়ো শয়তান, আর শয়তানের আণ্ডা দুটোই প্যাণ্ডেলে জাত-ইডিয়েটের মত হাঁ করে লৌড-স্পীকারের দিকে তাকিয়ে আছে। খাসা excuse আছে—আমার ডাক শুনতে পায়নি।

আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে অতিষ্ঠ। আর এরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভূমার সন্ধানে একেবারে লাউডস্পীকারের সদরে।

এরাই মহাজন! পরিবেশ—তা সে যা-ই হোক—পছন্দ করতে জানে।

আর আমার প্রতিবেশীদের ঈর্ষায় বুক ফেটে যাচ্ছে—আহা, ওরা যদি আমার বদলে এ বাড়ির বাসিন্দা হত।

৩·০০ ওঃ! "কী ভুল করিনু আমি যোগী"

মডার্ন্ কবিতা আকছারই মেশিনারী থেকে নিরন্তর inspirtion পায়।

W. C.-তে বসে শুনছিলুম—উপায়ান্তর নেই অন্তত সেখানে—একটা গানে বার বার যেন পিন গ্রুভে আটকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে বুঝলুম, অহহো। এটা deliberate নয়া টেকনীক। গাওয়াইয়া ঠিক groove-এ খাবি-খাওয়া পিনের অনুকরণে হুবহু একই শব্দ পাঁচবার—তারপর কিছু নির্ঝঞ্ঝাট গান—ফের একই শব্দ পাঁচবার—আবার ঐ গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁর অনুকরণে গান গাইছে।

১৩·১০ আঃ কি আরাম! মহাসঙ্গীত থেমেছে। ঢাকের বাদ্যি নাকি থেমে গেলে ভালো লাগে (সে আমলে গ্রামাঞ্চলেও শব্দকাতর সজ্জন ছিলেন! আশ্চর্য); আমি বলি এই মহাসঙ্গীতর বদলে আমি ঢাকের বাদ্যি any day prefer করবো।

যে গুণী বলেছিলেন,

কী কল পাতাইছ তুমি!
বিনা বাইন্তে নাচি (নাচি) আমি॥

তিনি প্যাণ্ডেলের এ মহাবাদ্য শুনলে কি করতেন!

১৩·৪০ ওরে মূর্খ, ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ! ঝাড়া তেরোটি বছর ইস্কুল কলেজে ইংরিজি পড়ে এই প্রবাদটুকু শিখিসনি, 'অরণ্যানীর লতাগুল্ম বিচ্ছিন্ন করে জনপদে পদার্পণ না করা পর্যন্ত হর্ষোল্লাস করে উঠিসনি।' কিংবা সেই বোগদাদী মূর্খ অন্‌নশ্‌শারের মত আণ্ডার ঝুড়ি সামনে রেখে রাজকুমারীকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিসনি।

আবার আবার সেই কামান গর্জন।

লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। এবং এরা অত্যন্ত আইন সম্মত আচরণ করে বলে সরকারি কর্মচারীদের মত আধ ঘণ্টার বেশী লাঞ্চ আওয়ারে নেয় না। সোনারটাঁদরা বাঁচলে হয়।

'কামান গর্জন' বললুম, কিন্তু কামান গর্জন গম্ভীর সিংহ গর্জনের বত আদৌ কর্ণপটাহ-বিদারক নয়। এমন কি চ্যাংড়া মেশিনগানের ক্যাটক্যাটও প্যাণ্ডেলের তাণ্ডব-আরাবের সামনে জুঁই ফুলের গানের মত মোলায়েম।

সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান
মেশীন গানের সম্মুখে গাই জুঁই ঐ ফুলের গান।

গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হুঁ। কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রলয় বাদ্যের সামনে তিনি কি গাইতেন?

১৪·০০ রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় না। আমার ভরসা দুপুর। দুপুর থেকে তিনটে অবধি দিবানিদ্রার। ঘুম লেগে আসছে, এবার কে যেন—কেসিয়াস ক্লে-ই হবে—পেটে মারে মোক্ষম গুত্তা। ফের no loudspeaker, এবারে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে পাঁজরে খোঁচা। চললো নিদেন আধঘণ্টা।…যা দেখলুম, এ যাবৎ আমার ঘুমটাই একমাত্র হীরো যে ঐ বিটকেল মুজিকীর সঙ্গে lost battle-এর rearguard action লড়লে।

মা কালী! একটা প্রশ্ন শুধবো মা, তুমি দুপুর বেলা এ্যাট্ট দিবানিদ্রা দাও না? না এই উৎকট—সেই যে তুলসীদাস বানরদের লঙ্কা আক্রমণের সময়কার বিকট শব্দ অনুপ্রাস সহযোগে প্রকাশ করেছেন—

কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিগহ ধাবহি—

কি বলছিলুম মা, এই কটকহি-ই কি তোমার অতি বিকটিনী দিবানিদ্রা আয়েশের আফিং!

১৭·৩১ আমি তো অগা। তাই শুধোই, সন্ধ্যা তো হল। দেবীর আরতিটারতি হবে না? তখন তো শাঁখটাঁখ বাজার কথা। সেটা শুরু হলে বাঁচি।

ম্যাডাম কালী ভূতনাথের কোন্ পক্ষ যেন হন। না, সে বুঝি অন্নপূর্ণা—

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে!

তা, ও, একই কথা। তা পাষাণ বাপ মরুক আর না-ই মরুক, ভাইয়ের অভিমানে যে বড্ড লাগে এটি বড়ই খাঁটি, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ঘরোয়া বাঙালীর গোপন গন্ধে-ভরা বেদনা!

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই।

১৮·০০ শাঁখ বাজলো না, লাউডস্পীকারও থামলো না। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে অবশ্যি শুধনো যায়। সর্বনাশ! ঈশ্বর রক্ষতু! আমার মত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পাড়ার মুরুব্বিকে উৎসাহিত কৌতূহলী দেখে তারা না আমাকে ডবলাপ্যায়িত করার জন্য আরেকটা লাউডস্পীকার-এর সন্ধানে ভূতের ঘোড়া চেপে ছুট লাগায়!

১৯·০০ 'ডাক্তারে যা বলেক বলুক না কো', আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস exercise physical movements of any sort স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় খতরনাক।

কিন্তু আর পারা গেল না। প্যাণ্ডেলের সঙ্গীত উচ্চতর হয়েছে। রাস্তায় নামতে হল।

প্রথমেই শুনলুম, 'লাউড্ স্পীকার বলছে, 'আজ রাত্রি আটটার সময় নির্ধারিত যাত্রা হবে না।' আমি প্রথমটায়

উল্লাস বোধ করেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বললে 'কাল হবে'।

সেটা নিশ্চয়ই মিন লা. স্পী. হবে না। সেটা কি এর চেয়েও খুনীয়া হবে? কে জানে!

এখান থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটি ছোট্ট ঘরে আরেক কালী। প্যাণ্ডেল লাউডস্পীকার কিছুই নেই। দু'চারটি বউ বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তায়ও যুবতী মা-ই বেশী। সন্তানের যেন অমঙ্গল না হয়।

২০১'৫ এবারে আরম্ভ হয়েছে যা তা অতুলনীয়। আধঘণ্টা ধরে রেকর্ড বাজছিল না। এখন organizer-রা বেসুরা গান গাইছেন, মাইক চরম চড়ায় তুলে। তবলাও চলছে। চতুর্দিক নিরব হয়ে যাওয়ার ফলে এবারে আমার suffering চরমে উঠেছে। কালীপূজোয় রাত জাগাটা তো স্বাভাবিক।

সকাল ১০' ৩০ ফের রেকর্ড চলছে।

গান

কীই বা হত তোমার রাজা
একটি মোরে দিলে
কীই বা ক্ষতি হত কারুর
বিরাট এ নিখিলে
তোমার বিশ্ব মধুকর
অমৃত বিভবে ভরা
কণাটুকু যেতো যদি তা
করুনা বর্ষিলে।

চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা
সাজাও আলোকমালা
তারায় তারায় বাঁধো তুমি
অলখ আলিপনা
তোমার এ যে পুন্যছবি
দিয়ে হত এর কি ক্ষতি
পিয়ার চেতনা আমার চোখে
যদি যেতো মিলে।

সুর
পণ্ডিত রতনজানকর
কলিকাতা ১৯৩৩।

কথা
সৈয়দ মুজতবা আলী

২১শে নভেম্বর ১৯৪৭

প্রিয় কণামিয়া, মৌলবী বাজার

কিসের কণা ভাবিয়া মনে হদীস নাহি পাই
হলপ তবু করিতে পারি তাঁহার সাথে নাই
জ্ঞানের যোগ, ইলিম আর বুদ্ধি যারে কয়
পেয়ছ মেলা সুযোগ তবু দাওনি পরিচয় !
না হলে এতদিনে
আসিতে হেথা, বলিতে হাসি, 'নিয়েছি আমি চিনে
যেমন করে মেঘের ডাকে ময়ূর উঠে নাচি
অলখকর-পরশ পেয়ে কুমুদ উঠে বাঁচি
—তপ্ত—খর নিদাঘ-দাহ দিবার অবসানে—।
অজানা কোন্ টানে ?
কিসের পরিচয় ?
ডাউকি হতে ছুটিল জল সাগরে হবে লয় ?
মেঘের বাণী, শুক্লা নিশি, সিন্ধু পারের ডাক,
চিনেছি আমি ভাষায় ভরা কভু বা নির্বাক।

উপযুক্ত তত্ত্বকথা করিতে সপ্রমাণ
চলিয়া আসো ত্বরিতগতি চড়িয়া মোটর যান।
সঙ্গে এনো তাবৎ লেখা তব
অছাপা ছাপা বেবাক মাল প্রাচীন আর নব।

কহেন গুণী, 'বাড়ীর জোরে বিশেষ এক প্রাণী
তেরিয়া হয়ে বীরেরে যায় হানি।'
আম্মো তাই সাহস করি তবে
—হুঙ্কারিয়া টঙ্গি ঘরে নাচিয়া ভৈরবে
মনের সুখে করিব গালাগাল,
বলিব, 'তব তাবৎ লেখা নেহাৎ জঞ্জাল
রদ্দি ওঁচা, ভ্যাপসা পচা, থাড্ডো কেলাশ অতি
ওরে রে দুর্মতি

বাড়াস কেন এ দুনিয়ার বিভীষিকার ভার
নাম যে কণা, কণামাত্র সন্দেহ নেই আর।'

১২ই জুন ১৯৫৫

মডার্ন কবিতা

এখানে কত রকম গরমই না পড়ে।
এবং বৃষ্টিও নামে কোনো প্রকারের নেটিশ না দিয়ে।
কাল দুপুর রাতে হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম।
সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রাণ যেন গান গেয়ে উঠল।

আজ সকাল থেকে ভ্যাপ্‌সা গরম।
কি করি, কি করি, কি করে গরম ভুলি।

এমন সময় এক বন্ধু এলেন এক ঠোঙ্গা কালো জাম নিয়ে!
কত বৎসরের পরে কালো জাম!

মনে পড়ল,
বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল,
আমি যখন একদিন এই রঙের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলুম,
কারণ আমার রঙ তখন ছিল ফর্সা,
—আজ আমার ছেলে ফিরোজের মত—।

হার্টটা দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেল।

HEINE

[আজ সকালে হাইনের কবিতা অনুবাদ করলুম]

সত্যি সত্যি আমরা দুজনে মিলে
অদ্ভুত এক গড়েছি প্রেমের জোড়া
প্রিয়া মোর পায়ে না পারে দাঁড়াতে ভালো
আর আমি? আমি একবারে হায় খোঁড়া।

ব্যামোতে কাতর সে যেন বেরাল-ছানা
আমি তো কুকুর শুয়ে শুয়ে কাতরাই,
আমার মনেতে সন্দেহ আছে মেলা
দুজনার সাথে বেশ কিছু আছে বাই।

তার মনে লয় কমলিনী তিনি নাকি
কল্পনা করে গড়েছে আপন মনে
ফ্যাকাশে চেহারা—তাই লয় মোর মন
নিজেরে হেরো না, চন্দ্রমাসম গণে!

কমলিনী ঐ খুলিল পাপড়িগুলি
চন্দ্রমা পানে তুলে ধরে তার আঁখি
কোথায় না ভরা সফল জীবন পাবে—
হাতে তার, হায়, কবিতাটি শুধু রাখি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভবিল। পরাধীন দীন দগ্ধ-ভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্য বলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!

নববর্ষ

স্নেহের মুকুল,

তুমি তো আক্কেল ধরো, বলো তো আমারে
নববর্ষ লয়ে কেন ফাটাফাটি প্রতিবারে !
পুরনো বছরটারে বাতাস কুলার
দিয়ে কেন ঝাঁটা দিয়ে করে দেয় বার ?
কি দোষ করেছে, কও, পুরানো বছর
তারেই তো নিয়ে বাবা, করে নিলে ঘর
তিনশ পঁষট্টি দিন। গেল কি খারাপ,
উঠেনি কি সূর্য বুঝি, দেয় নি কি তাপ ?
উঠোন বাজারে মাছ ভালো মন্দ যাই,
ব্লেডেতে কাটিয়া মাছ দিন কাটে নাই ?
মদ্য খেয়ে চাচা বুঝি হয় নাই টং
পুপু পুটু মীরামাই করে নাই ঢং
যার যাহা, অভিরুচি ? টেটেন পটের
বীবী সেজে বেরয় নি ? মেজদা ঘটের
বুদ্ধিটি খরছ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
মাথায় বুলায়ে হাত এনেছে এস্তের
খরছ করেনি তারো বেশী ? পদি সিসি
করেনি ক্যাটের ক্যাট ? ভাঙা ফাটা শিশি
করেনি কি বিক্রি, রামা, টুপাইস তরে ?
বৌদি চষেনি মাঠ চক্করে চক্করে
টাট্টু ঘোড়া যেন হায় ! যাবে অলিম্পিকে।
বড়দা করেনি রাঙ্গা বাড়িটারে পিকে ?
পাকু মাম গুড়গুড়ি বাবুজী জামাই
করেনি কি দিবারাত্রি শুধু খাই খাই ?
রকেতে দুজনা বসি করি নি কি প্ল্যান
টুপাইস কামাবো বলি—খুদা যদি দ্যান !

কে জানে জর্মনি বসে হয়তো ভাইয়া
করে রেখে আছে ব্লণ্ড গণ্ডা দুই বিয়া !

(২)

তবে কি পুরানা সাল ছিল দিশী সস্তা
তাহারে বিদায় দিয়া ভরি বস্তা বস্তা
আনিবে জর্মন মাল কিংবা সে বিলাতি
নববর্ষ—গ্যারান্টিড পাকা সে বেসাতি !
চলিবে দশটি সন এক নব বর্ষে
কই, দিদি, বলে না তো চোখেতে সরষে—
দেখি যবে, বলে কিনা এরেও বিদায়
দেওয়া হবে। বারো মাস হয়ে গেল, হায় !

(৩)

তুমি তো সেয়ানা মেয়ে চালাও সংসার
বলো দেখি তবে কেন এহেন ব্যাভার ?—
বাজে খর্চা একদম—পুরানাটা যবে
দিব্য কাজ দিয়ে যায় ; নয়া আনা তবে ?

বর

মুখ থান্ কেনে মেঘলা মেঘলা
চউক্ষে কেনে পানি
ঠোঁট ফুলাইয়া থাকলে পরে
কেমুন কইরা জানি।

কনে

ছলে বলে বানছো আমায়
কাইরা নিছো মন
কাইলকা যা কইছিলাম, নাগর
আছে নি স্মরণ ?

বর

জেওর-বেসর যত চাইছ
ঢ্যাইল্যা দিমু পায়
একটু খানি হাস কন্যা
পরাণ জ্বইল্যা যায় ॥

পিলসুজ পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা ;
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অবহেলে
মাভৈ বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে-আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

'দিনলিপি'তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

১। রাবেয়া—লেখকের স্ত্রী।

২। ফিরোজ—লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৩। ভজু—লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র।

৪। বিশী—প্রফুল্লকুমার বিশী (লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মধ্যম ভ্রাতা)